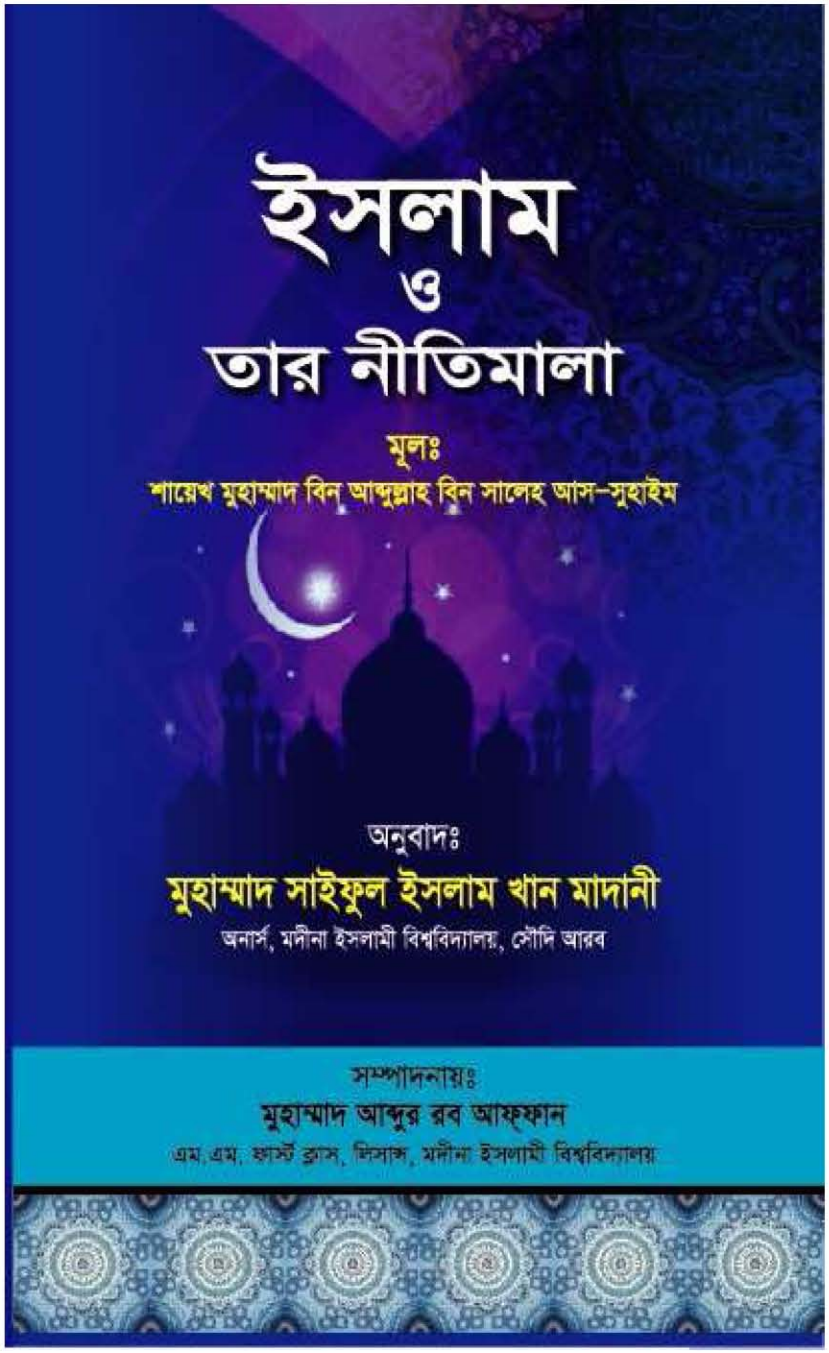

ইসলাম ও তার নীতিমালা

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালেহ আস-সুহাইম

ইসলাম
ও
তার নীতিমালা

الإِسْلَام أُصُوله ومَبَادِئه

تأليف

الشيخ محمد بن عبد الله بن صالح السحيم

মূলঃ
শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালেহ আস-সুহাইম

অনুবাদঃ
মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী
দাওরা হাদীস ঢাকা, বাংলাদেশ
অনার্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

সম্পাদনায়ঃ
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান
এম.এম ফার্স্ট ক্লাস, লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

ইসলাম
ও
তার নীতিমালা

মূলঃ
শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালেহ আস-সুহাইম

অনুবাদঃ
মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী
দাওরা হাদীস ঢাকা, বাংলাদেশ
অনার্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

সম্পাদনায়ঃ
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান
এম.এম ফার্স্ট ক্লাস, লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

প্রথম প্রকাশঃ
সেপ্টেম্বর ২০১৬, জিলহজ্জ ১৪৩৭ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ত্ব ঃ
মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী

মূল্যঃ ৬০ টাকা (নির্ধারিত)

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	অনুবাদকের আরজ	৯
২	ভূমিকা	১১
৩	গন্তব্য কোথায়?	১৫
৪	মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত, এককত্ব ও উলুহিয়্যাতের বর্ণনা	১৬
৫	(১) বিশ্ব পরিমণ্ডল ও তার মাঝের সকল কিছুর সৃষ্টি এক অসাধরণ কাজ	২০
৬	(২) জন্মগত ফিতরাত	২১
৭	(৩) সকল উম্মাতের ইজমা বা ঐকমত্য	২৩
৮	(৪) যুক্তির দাবি	২৪
৯	মহাজগতের সৃষ্টি	৩২
১০	মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য	৩৭
১১	(১) মানুষের অধীনস্ত ও সেবায় নিয়োজিত করা	৩৭
১২	(২) আকাশ ও যমীনসহ সবকিছুকে আল্লাহ তা'য়ালার রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের উপর সাক্ষী ও নিদর্শন বানান	৩৮
১৩	(৩) পুনরুত্থানের উপর সাক্ষী বা প্রমাণস্বরূপ	৩৯
১৪	মানব সৃষ্টি ও তার মর্যাদা	৪২
১৫	নারীর মর্যাদা	৪৯
১৬	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৫৪
১৭	মানুষের দ্বীন বা ধর্ম প্রয়োজনীয়তা	৫৮

১৮	সত্য দ্বীনের (ধর্মের) মূলনীতি	৬৩
১৯	যে মূলনীতির দ্বারা সত্য দ্বীন ও বাতিল দ্বীনের মাঝে আমরা পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবো তার বর্ণনা	৬৪
২০	দ্বীন বা ধর্মের প্রকার	৭১
২১	বিদ্যমান ধর্ম গুলোর অবস্থা	৭৪
২২	নবুওয়াতের তাৎপর্য	৮১
২৩	নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী	৮৭
২৪	রাসূলগণের প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা	৯০
২৫	সংক্ষিপ্তাকারে রেসালাতের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা	৯৩
২৬	আখেরাত বা পরকাল	৯৫
২৭	ব্যক্তি ও সমাজে কিয়ামত দিবসকে বিশ্বাস করার কতিপয় উপকারীতা	১০০
২৮	রাসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা	১০১
২৯	চিরস্থায়ী রিসালাত	১০৫
৩০	রোম সম্রাট হিরাকলের সাক্ষ্য	১১১
৩১	জন সন্ট নামক সাম্প্রতিককালের এক ইংরেজ খ্রীস্টানের সাক্ষ্য	১১৫
৩২	খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি	১১৫
৩৩	ইসলাম শব্দের অর্থ	১১৮
৩৪	ইসলামের পরিচয়	১১৮
৩৫	ইসলামের হাক্বীক্বত বা তাৎপর্য	১১৯
৩৬	কুফরের প্রকৃত অবস্থা	১২২
৩৭	ইসলামের উৎসসমূহ	১২৭
৩৮	(ক) মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন	১২৭
৩৯	(খ) নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাহ তথা হাদীস	১৩৬

৪০	দ্বীনের স্তরসমূহ	১৩৯
৪১	প্রথম স্তর ঃ ইসলাম	১৪০
৪২	ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ	১৪০
৪৩	প্রথম রোকনঃ কালেমায়ে শাহাদাত বা দু'টি সাক্ষ্যদান	১৪০
৪৪	দ্বিতীয় রোকনঃ সালাত বা নামায	১৪১
৪৫	তৃতীয় রোকনঃ যাকাত	১৪২
৪৬	চতুর্থ রোকনঃ সিয়াম বা রোযা	১৪৩
৪৭	পঞ্চম রোকনঃ হজ্ব	১৪৪
৪৮	ইসলামে ইবাদতের সংজ্ঞা	১৪৬
৪৯	দ্বিতীয় স্তর ঃ ঈমান	১৪৭
৫০	ঈমানের রোকনসমূহ	১৪৭
৫১	প্রথমঃ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা	১৪৮
৫২	আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কতিপয় ফলাফল	১৪৯
৫৩	দ্বিতীয়ঃ ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাস	১৫০
৫৪	ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কিছু উপকারীতা	১৫২
৫৬	তৃতীয়ঃ আল্লাহ প্রদত্ত আসমনী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস	১৫২
৫৭	আল্-কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মাঝে পার্থক্যের কিছু কারণ	১৫৩
৫৫	কুরআন পাঠ-পঠন ও বর্ণনার নিয়ম-পদ্ধতি	১৫৪
৫৮	চতুর্থঃ নবী-পয়গাম্বরদর প্রতি বিশ্বাস	১৫৬
৫৯	পঞ্চমঃ কিয়ামত বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস	১৬০
৬০	ষষ্ঠঃ তাক্বদীর বা ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস	১৬৫
৬১	তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার উপকারীতা	১৬৭
৬২	তৃতীয় স্তর ঃ ইহসান	১৬৮
৬৩	ইসলাম ধর্মের কতিপয় আদর্শ ও গুণাবলী	১৭১

৬৪	(১) এটি আল্লাহর দ্বীন ঃ	১৭৩
৬৫	(২) সকল বিষয়ের সমাহার বা ব্যাপকতা	১৭৩
৬৬	(৩) সৃষ্টিজীবের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক স্থাপন করে	১৭৪
৬৭	(৪) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি মনোযোগ	১৭৫
৬৮	(৫) সহজসাধ্য	১৭৬
৬৯	(৬) ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা	১৭৮
৭০	(৭) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ	১৭৮
৭১	তাওবা	১৭৯
৭২	তাওবার গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় উপকারীতা ও প্রভাব	১৮১
৭৩	যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে না তার শাস্তি	১৮৪
৭৪	কুফুরির কিছু পরিণাম	১৮৫
৭৫	(১) ভয়-ভীতি ও অশান্তি	১৮৫
৭৬	(২) সঙ্কীর্ণ জীবন	১৮৬
৭৭	(৩) যে কুফরী করে সে সঙ্ঘাতের মধ্যে জীবনযাপন করে	১৮৭
৭৮	(৪) সে মূর্খ হয়ে বেঁচে থাকে	১৮৯
৭৯	(৫) কাফের জুলুমকারী হিসাবে বেঁচে থাকে	১৮৯
৮০	(৬) দুনিয়াতে সে নিজেকে আল্লাহর ঘৃণা ও গজবের সম্মুখীন করে	১৮৯
৮১	(৭) তার ব্যর্থতা ও ধ্বংস অনিবার্য হয়	১৯১
৮২	(৮) সে তার প্রতিপালকের প্রতি অবিশ্বাসী এবং তাঁর নেয়ামতের অস্বীকারকারীরূপে বসবাস করে	১৯২
৮৩	(৯) সে প্রকৃত জীবন হতে বঞ্চিত হয়	১৯২
৮৪	(১০) সে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে	১৯৪
৮৫	উপসংহার	১৯৭

অনুবাদকের আরজ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের মালিক একক-অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'য়ালার। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী ও রাসূলের ইমাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি। যিনি হলেন নবী ও রাসূলগণের পরিসমাপ্তকারী। যার পরে আর কোন নবী নেই এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাদের প্রতি।

আমার একান্ত ব্যক্তিগত এক কাজে রিয়াদ গেলে সৌদি আরব ধর্ম মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ও দাঈ আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শায়খ মুহাম্মাদ যীরের সাথে তাঁর মসজিদে দেখা করি। কথার এক পর্যায়ে তিনি শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালেহ আস-সুহাইমের লিখিত "আল ইসলাম উসূলুহু ওয়া মাবাদিউহু" নামক কিতাবটি ভাংলা ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। কারণ গ্রন্থটি মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য। গ্রন্থটিতে তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির হিকমত, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সত্য দ্বীনের (ধর্মের) মূলনীতি, বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা, চিরস্থায়ী রিসালত, খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি, ইসলাম ধর্মের পরিচিতি, ইসলাম ধর্মের কতিপয় আদর্শ ও গুণাবলী, ইসলাম গ্রহণ না করলে তার শাস্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো এত সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন যে, যদি কোন সত্যান্বেষী অমুসলিম নিরপেক্ষভাবে পড়েন তবে আশা করা যায়, তিনি সত্যকে গ্রহণ করবেন। আর যদি কোন দুর্বল ঈমানের মুসলিম ভাই পড়েন, তবে আশা করা যায় ইসলাম সম্পর্কে তার মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে। সুতরাং গ্রন্থটির মধ্যে সকলের জন্যই খোরাক রয়েছে। ফলে তা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য অনুবাদ করা অত্যন্ত জরুরী মনে করি এবং স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়েও আল্লাহর সাহায্য কামনা করে অনুবাদ করা আরম্ভ করি।

আল্লাহ তা'য়ালার জন্য অসংখ্য সিজদায়ে শুকর জ্ঞাপন করি, যাঁর অশেষ মেহেরবাণীতে আমার মত একজন অধমের দ্বারা অত্র বইটির অনুবাদ কাজ শেষ হয়েছে। তবে আমার মত নগণ্যের দ্বারা বইটির অনুবাদ কাজ শেষ করা সম্ভব হতো না, যদি আল্লাহর খাস মেহেরবানী না থাকতো, অতঃপর যদি অন্যান্য ভাইদের সার্বিক সহযোগিতা না পেতাম।

বিশেষ করে যাদের নাম না নিলে চরম অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে যেমন; রিয়াদস্থ পশ্চিম দ্বীরা ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত দাঈ শায়খ আব্দুর রব আফ্ফান আল-মাদানী। যিনি আমাকে তাঁর শত ব্যস্ততা থাকা সত্বেও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং সম্পাদনার গুরুদায়িত্বও পালন করেছেন। এরপর রয়েছেন খামিস ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত দু'জন উর্দু দাঈ শায়খ সউদ বিন মাকসূদ আহমাদ মাদানী ও শায়খ আইয়ূব বিন আবদুল গণি আল-মাদানী নেপালী এবং বাংলা ভাষার দাঈ আমার সহকর্মী শায়খ আব্দুল হামীদ বিন সিদ্দীক হোসাইন সালাফী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত আব্দুল মোমীন ও আনিসুর রহমান। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমার সহধর্মীনি উম্মে সামিয়ার, যিনি বইটির অনুবাদ কাজ হাতে নেয়ার পর হতেই সব সময় আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা যেন এ শ্রমটুকু আমার ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য করেন। আমীন!

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ বইটির কোথাও ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা যে কোন পরামর্শ থাকলে, আমাকে অবগত করবেন পরবর্তী সংস্করণে ইনশা-আল্লাহ সংশোধন করা হবে। ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম।

বিনীত নিবেদক
আপনাদের সকলের দোয়া প্রার্থী
মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খান
+৯৬৬০৫৩৫৯২৭১৫৯
ই-মেইল: Mohammadsaif.islam@gmail.com
১৩ ই রজব ১৪৩২ হিজরী, খামিস মোশাইত, সৌদি আরব।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের আত্মার যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে এবং আমাদের সমস্ত কাজকর্মের গুনাহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত দূত। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও অসংখ্য শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সম্মানিত রাসূলগণকে বিশ্ববাসীর নিকট এজন্যে প্রেরণ করেন, যেন তারা রাসূল আগমনের পরে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে। আর তিনি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেন, যা হেদায়াত, রহমত, আলো এবং রোগমুক্তির কারণস্বরূপ। আর ইতিপূর্বের সকল রাসূলই তাঁদের নির্দিষ্ট স্বজাতীর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁরাই তাঁদের কিতাবসমূহকে হেফাজত করতেন। ফলে (তাঁদের মৃত্যুর পর) তাঁদের লেখাসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তাদের শরীয়তও বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। কারণ তা নির্দিষ্ট একটি জাতীর নিকট এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সকল নবী ও রাসূলগণের পরিসমাপ্তকারী হিসেবে করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [ال أحزاب: ٤٠]

অর্থাৎঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)। (এটি মহা গ্রন্থ "আল কুরআনুল কারীম" হতে একটি উদ্ধৃতি, যা আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ করেন। আর আমার এই গ্রন্থের মধ্যে কুরআনুল কারীমের অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। সেগুলোর পূর্বে সাধারণত যা থাকবে তা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন" অথবা "মহান আল্লাহ বলেন" অথবা "পবিত্র আল্লাহ বলেন" অথবা "মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন" ইত্যাদি)।

আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি সর্বোত্তম কিতাব "আল কুরআন" অবতীর্ণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজেই তার

হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এর হেফাজতের দায়িত্ব তাঁর কোন সৃষ্টি জীবের উপর ছেড়ে দেননি। যেমন তিনি এরশাদ করেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر : ٩]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আমি আন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর হিফাজতকারী। (সূরা হিজর ১৫ ঃ ৯)

আল্লাহ তাঁর শরীয়তকে কিয়ামত অবধি স্থায়ী করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর শরীয়তে অবিচল থাকার বিষয়সমূহের মধ্যে হলঃ তার প্রতি ঈমান আনা, তার দিকে আহ্বান করা, তার উপর ধৈর্য্য ধারণ করা ইত্যাদি। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পথ ও পদ্ধতি এবং তাঁর পরে তাঁর অনুসারীগণের পথ ও পদ্ধতি হলঃ জেনে-বুঝে সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। এই পদ্ধতির কথা আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে বলেন ঃ

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: ١٠٨]

অর্থাৎঃ (হে রাসূল) আপনি বলুনঃ এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও, আল্লাহ মহান পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০৮)

আল্লাহ তা'য়ালা নবী (ﷺ)-কে তাঁর পথে কষ্টের জন্য ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন ঃ

{فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف : ٣٥]

অর্থাৎঃ সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহক্বাফ ৪৬ ঃ ৩৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران : ٢٠٠]

অর্থাৎঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আল্ ইমরান ৩ ঃ ২০০)

আল্লাহর পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই পদ্ধতির অনুসরণ করে, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতকে দলীল

হিসেবে গ্রহণ করে গ্রন্থটি রচনা করি। এর মধ্যে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি ও তার মর্যাদা, তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ, সাবেক ধর্মগুলোর অবস্থা ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। অতঃপর ইসলামের অর্থ এবং রোকনসমূহের পরিচয় তুলে ধরেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি হেদায়েত চায়, তার সামনে এগুলোই তার প্রমাণপুঞ্জি। আর যে ব্যক্তি নাজাত বা মুক্তি চায় তার জন্য আমি সে পথের বিশ্লেষণ করেছি। যারা নবী, রাসূল ও সৎ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়, তাদের জন্য পথ এটাই। আর যে ব্যক্তি তা পরিহার করে, সে একান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় এবং সে ভ্রান্ত রাস্তার অনুসরণ করে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসরীগণ, তারা তাদের ধর্মের দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, অন্যদের তুলনায় হক্ব তাদের সাথেই রয়েছে (অর্থাৎ তারাই একমাত্র সত্যের উপর রয়েছে)। আর প্রত্যেক শুদ্ধ আক্বীদার অনুসারীগণ মানুষকে তাদের স্বীয় মত পোষণকারীর অনুসরণ এবং তাদের দলের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার দিকে আহ্বান করে। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান কাউকে তার নিজস্ব পথ অনুসরণের আহ্বান করে না। কারণ তার নির্দিষ্ট আলাদা কোন পথ নেই। বরং তার দ্বীন তো আল্লাহরই দ্বীন, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران : ١٩]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। (সূরা আল্ ইমরান ৩ ঃ ২০০)

সে কোন মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিকেও আহ্বান করে না। কারণ আল্লাহর দ্বীনের সামনে সকল মানুষ সমান। একমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি ছাড়া তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। ফলে সে মানুষকে তাদের প্রতিপালকের পথে চলতে, তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে, আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি যে শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন এবং সকল মানুষের নিকট তাঁকে যা প্রচার করার আদেশ করেছেন, তা অনুসরণ করার আহ্বান করেন। বস্তুত এই কারণে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যা দিয়ে তিনি সর্বশেষ রাসূল প্রেরণ করেছেন, তার দিকে মানুষকে আহ্বানের লক্ষ্যে, যে হেদায়েত চায় তাকে পথ প্রদর্শন করতে এবং যে মঙ্গল কামনা করে, তার জন্য নির্দেশিকাস্বরূপ এই কিতাব রচনা করি।

আল্লাহর শপথ! একমাত্র এই দ্বীন ব্যতীত কোন সৃষ্টিকুলই প্রকৃত কল্যাণ বা সুখ পাবে না। আর যে ব্যক্তি প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর প্রতি, রাসূল

হিসাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি এবং দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ শান্তি পাবে না। পূর্বে ও বর্তমান যুগে হাজার হাজার ইসলামের হেদায়েতপ্রাপ্তগণ স্বীকার করেছেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরই প্রকৃত জীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেই সুখ ও কল্যাণের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। অথচ প্রত্যেকেই কল্যাণের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং প্রশান্তি ও বাস্তবতা অনুসন্ধান করে। আমি এই গ্রন্থ রচনা করে আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন এই আমলকে নির্ভেজালভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর পথের একজন দাঈ (আহ্বানকারী) হিসাবে গণ্য করেন। আর তিনি তা কবুল করেন। তিনি যেন এই কাজটিকে ঐসব সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত করেন, যা তার সম্পাদনকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারে আসবে। যারা এটা ছাপাতে চায় অথবা যে কোন ভাষাতে অনুবাদ করতে চায়, আমি তাদেরকে এর অনুমতি দিলাম। তবে শর্ত হল ঃ যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে, তার যেন আমানত রক্ষা করে। আর আমাকে অনুবাদের এক কপি দিয়ে, তিনি যেন আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, যাতে করে তা হতে উপকার লাভ করতে পারি এবং একই পরিশ্রম যেন বার বার না করা হয়। তেমনি আশা করি, যদি কারো কোন প্রকার মন্তব্য অথবা সংশোধনী থাকে, চাই তা মূল আরবী কিতাব সম্পর্কে হোক অথবা এর যে কোন ভাষায় অনূদিত কিতাব সম্পর্কে হোক, তিনি যেন আমার নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছে দেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অনাদি ও অনন্ত, প্রকাশমান ও অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্যে ও গোপনে, সর্বপ্রথমে ও সর্বশেষে একমাত্র তাঁরই প্রশংসা। তাঁর জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং আমাদের প্রতিপালক অন্য যা কিছু চান, তা পূর্ণ করে দেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর সাহাবাবৃন্দের উপর এবং যারা তাঁর পথ ও পন্থার উপর চলে, তাদের সকলের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত অসংখ্য রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

লেখক
ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সলেহ আস সুহাইম
রিয়াদঃ ১৩/১০/১৪২০ হিজরী
পোষ্ট বক্সঃ ১০৩২ রিয়াদঃ ১৩৪২
অথবা পোষ্ট বক্সঃ ৬২৪৯ রিয়াদঃ ১১৪৪২

গন্তব্য কোথায়?

মানুষ যখন বড় হতে শুরু করে এবং বুঝতে শিখে তখন তার মাথায় বেশ কিছু প্রশ্ন জাগে। আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? আবার কোথায় ফিরে যাবো? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কে? কে এই পৃথিবীর মালিক এবং কেউ-বা এর পরিচালক? এ ধরণের আরো অনেক কথা তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মানুষ কেবল এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানলেই তার উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো পালিত হয়ে যায় না; বরং যথাযথভাবে মানতে হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম নয়। কারণ এই বিষয়গুলো ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূলত এ কারণেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে অনেক কল্প-কাহিনী, কুসংস্কার ও রূপকথার জন্ম হয়েছে, যা মানুষের বিস্ময় ও দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এর উত্তরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মানুষ তখনই দিতে পারবে যখন মহান আল্লাহ তাকে সঠিক ধর্মের দিকে পথ প্রদর্শন করবেন, যার মধ্যে এই বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কারণ এগুলো অদৃশ্যের বিষয়। সঠিক ধর্ম শুধুমাত্র সত্য ও হক্বের কথা বলে। কেননা তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের নিকট ওহীকৃত বাণী। তাই প্রত্যেক মানুষের জন্য সঠিক দ্বীন অন্বেষণ করা এবং এর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা আবশ্যক। যাতে করে তার সন্দেহ ও বিস্ময় দূর হয় এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।

হে পাঠক বৃন্দ! নিম্নোক্ত আলোচনায় আমি আপনাকে মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত পথের অনুসরণ করতে আহ্বান করবো এবং সাথে সাথে এর কিছু যুক্তি-প্রমাণও উল্লেখ করবো। যাতে করে আপনি মনোযোগ ও ধৈর্য্য সহকারে বিষয়গুলো খেয়াল করেন।

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত, এককত্ব ও উলুহিয়্যাতের বর্ণনা ঃ[১]

অসংখ্য মানুষ স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির অর্থাৎ গাছ-পালা, পাথর এবং মানুষের উপাসনা করে থাকে। আর এজন্যই ইয়াহুদী ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে (ﷺ)-কে আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী ও তাঁর অস্তিত্বের উৎস জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পরিচয় জানিয়ে নিচের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - اللهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الاخلاص:١ – ٤)

অর্থাৎঃ হে মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনি বলুনঃ তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাস ১১২ ঃ ১ - ৪)

তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (لأعراف:٥٤)

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হন, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, এমনভাবে যে, রাত্রি ও দিবস একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বড়িত গতিতে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত, জেনে রাখো; সৃষ্টির এবং

১. বিস্তারিত দেখুনঃ শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত "আল আক্বীদাহ আস-সহীহা ওমা ইউজাদ্দুহা" এবং শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত "আক্বীদাতু আহলেস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ"।

হুকুমের একমাত্র কর্তা তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকতময়। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৫৪)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ - وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

অর্থাৎঃ আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছো; অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুবর্তী করেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বতমালা ও নদী সৃষ্টি করেছেন আর প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ

اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) (الرعد:٩)

অর্থাৎঃ প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে-বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ২, ৩ ও ৮, ৯)

তিনি আরো বলেন ঃ

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ

تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد:١٦)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ)! আপনি তাদেরকে বলুনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে? বলুনঃ আল্লাহ; বলুনঃ তবে কি তোমরা তাঁর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছো, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? আপনি তাদেরকে বলুনঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ১৬)

মহান আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহকে স্বাক্ষী ও প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (فصلت:٣٧ – ٣٩)

অর্থাৎঃ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তারা (কাফেরগণ) অহঙ্কার করলে, যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে (ফেরেশতাগণ) তারা তো দিন ও রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না। আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনি মৃতের জীবন দানকারী। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ৪১ ঃ ৩৭- ৩৯)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ - وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (الروم: ٢٢- ٢٣)

অর্থাৎঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা। (সূরা রূম ৩০ ঃ ২২-২৩)

মহা পবিত্র আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা বর্ণনা করে বলেন ঃ

اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (البقرة: من الآية٢٥٥)

অর্থাৎঃ আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না, নভোমণ্ডলে ও ভুমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই; এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন; তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না। (সূরা বাক্বারা ২ ঃ ২৫৫)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন ঃ

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (غافر:٣)

অর্থাৎঃ যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, যিনি শাস্তিদানে কঠোর এবং শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন। (সূরা গাফির ৪০ ঃ ৩)

তিনি আরো বলেন ঃ

هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الحشر:٢٣)

অর্থাৎঃ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, অতীব পবিত্র, পরিপূর্ণ, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত, যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ২৩)

তিনিই মহান উপাস্য, প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাশালী প্রতিপালক যিনি তাঁর বান্দাদেরকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে অবগত করলেন এবং তাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহকে স্বাক্ষী ও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করলেন। আর নিজেকে পরিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করলেন। এসবকিছু তাঁর অস্তিত্ব, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের সাক্ষ্য দেয়। রাসূল (ﷺ)-এর আনীত শরীয়ত এমনকি বিবেকশক্তি ও সৃষ্টিগত ফিতরাত বা স্বভাবও এর সাক্ষ্য দেয়। কোন জাতি এর দ্বিমত পোষণ করেনি। আমি এখন এর সামান্য কিছু আপনার সামনে তুলে ধরবো। অতএব তাঁর অস্তিত্ব ও রুবুবিয়্যাতের প্রমাণ হিসেবে বলব ঃ

(১) বিশ্ব পরিমণ্ডল ও তার মাঝের সকল কিছুর সৃষ্টি এক অসাধারণ কাজঃ হে মানব! বিশাল সৃষ্টিজগত আপনাকে ঘিরে রেখেছে। আকাশমণ্ডলী, তারকারাজী, ছায়াপথ ও বিস্তৃত যমীন নিয়ে এই সৃষ্টিজগত। আর এই যমীনে পাশাপাশি অসংখ্য ভূখণ্ড রয়েছে এবং প্রত্যেক ভূখণ্ডের উৎপাদন অন্যের চেয়ে ভিন্ন। এতে রয়েছে নানা জাতের ফল ফলাদি। দেখতে পাবেন এখানে প্রত্যেক সৃষ্টিকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এই বিশ্বজগত আপনা-আপনি সৃজিত হয়নি। এর জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রয়োজন। কেননা আপনা-আপনি তা সৃজিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অপূর্ব পদ্ধতিতে কে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন? কে এর সৌন্দর্য দান করেছেন? এবং কে দর্শকদের জন্য তা নিদর্শন করেছেন? উত্তরে যার নাম উঠে আসে তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। যিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক ও প্রকৃত উপাস্য নেই।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ - أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ (الطور:٣٦)

অর্থাৎঃ তারা কি কোন কিছু ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো বিশ্বাস করে না। (সূরা তূর ৫২ ঃ ৩৫-৩৬)

আয়াত দুটি থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয় ঃ

* তাদেরকে কি কোন অস্তিত্ব ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে?

* তারা কি নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে?

* তারা কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে?

যদি তাদেরকে কোন অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করা না হয়ে থাকে, নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করে না থাকে এবং আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা তারা না হয়, তবে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যিনি তাদের এবং আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। আর সেই সৃষ্টিকর্তা হলেন একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা।

(২) জন্মগত ফিতরাত ঃ সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই শর্তে যে, সে তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেবে। তিনি হলেন সকলের চেয়ে সুমহান, সর্ববৃহৎ, মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতম। এই ব্যাপারটি ফিতরাতের মধ্যে গাণিতীক বিষয়ের শক্ত ভিত্তির চেয়ে মজবুতভাবে গেড়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য কোন দলিল উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই; কিন্তু যার জন্মগত প্রকৃত স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, যাতে চিরসত্য কথাটিকে অস্বীকার করার দুঃসাহস তৈরী হয়েছে, তার ক্ষেত্রে দলিল প্রয়োজন। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রচিত "মাজমু' ফাতাওয়া" ১ম খণ্ড; ৪৭-৪৯ এবং ৭৩ নং পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (الروم:٣٠)

অর্থাৎঃ আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত), যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন (ধর্ম)। (সূরা রূম ৩০ ঃ ৩০)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ)

অর্থাৎঃ প্রতিটি নবজাত সন্তান ইসলাম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তার পিতা মাতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপুজক করে। যেমন জীবজন্তু নিখুঁত শাবক প্রসব করে, তুমি কি সেখানে কোন ত্রুটিযুক্ত শাবক দেখতে পাও? তারপর আবূ হুরাইরা (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ করতে পারঃ

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ

অর্থাৎঃ আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত), যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (বুখারী ঃ তাক্বদীর অধ্যায়; পরিচ্ছেদ নং ৩ এবং মুসলিমঃ অধ্যায়; ঐ, হাদীস নং ২৬৫৮, হাদীসের শব্দগুলো তারই)

নবী (ﷺ) আরো বলেনঃ

(ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ،وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)

অর্থাৎঃ আমার প্রতিপালক আমাকে যে সমস্ত তথ্য দান করেছেন তা তোমাদের অজানা থাকলে আমাকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বান্দাকে যে সম্পদ দান করেছি তা তার জন্য হালাল এবং

আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে হকের উপর নিষ্ঠাবান করে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিক্ষিপ্ত করল। আমি যা তাদের জন্য হালাল করেছি তা হারাম করল এবং অযৌক্তিক বিষয়কে আমার সাথে অংশীদার করতে নির্দেশ দিল। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ; ৪র্থ খণ্ড, ১৬২ নং পৃষ্ঠা এবং সহীহ মুসলিম; জান্নাত এবং তার সুখ ও তার বাসিন্দাদের বর্ণনা অধ্যায়, হাদীস নং ২৮৬৫, হাদীসের শব্দগুলো তারই)

(৩) সকল উম্মাতের ইজমা বা ঐক্যমতঃ (إجماع الأمة)

অতীত ও বর্তমান সকল উম্মত একমত যে, এই বিশ্ব পরিমণ্ডলের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। তিনি হলেন তার একমাত্র পরিচালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্টিতে কারো অংশীদারীত্ব নেই, যেমন তাঁর রাজত্বে কোন ভাগীদার নেই। পূর্বের কোন জাতি (যারা বিভিন্ন উপাস্যের ইবাদত করত) এই বিশ্বাস পোষণ করত না যে, তাদের উপাস্যগুলো আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিতে আল্লাহর সঙ্গে কারো অংশীদার ছিল। বরং তারা বিশ্বাস করত একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই তাদের এবং তাদের উপাস্যদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা নেই। কল্যাণ ও অকল্যাণ কেবলমাত্র তাঁরই হাতে। (মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াঃ ১৪ তম খণ্ড; ৩৮০-৩৮৩ এবং ৭ম খণ্ড; ৭৫ নং পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'য়ালার রুবুবিয়্যাতকে মুশরিকরা যে স্বীকার করে নিয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেনঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ - اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (العنكبوت:٦١-٦٣)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ)! আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ

করছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ! তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর রিযিক বৃদ্ধি করেন আর যাকে ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ মরে যাওয়ার পর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে কে যমীনকে জীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ! বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুভব করে না। (সূরা আনকাবূত ২৯ ঃ ৬১-৬৩)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (الزخرف:٩)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ)! আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ! (সূরা যুখরুফ ৪৩ ঃ ৯)

(৪) যুক্তির দাবিঃ (الضرورة العقلية)

সব বিবেক শক্তি একযোগে স্বীকৃতি দেয় যে, এই পৃথিবীর একজন মহান সৃষ্টিকর্তা আছেন। কারণ বিবেক এই পৃথিবীটাকে একটি সৃষ্ট বা মাখলুক মনে করে। আর তা নিজে নিজেই আবিস্কৃত হয়নি। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তা থাকেন। মানুষ জানে যে, সে বিভিন্ন সময়ে নানা বিপদ ও জটিলতার সম্মুখীন হয়। আর যখন সে তা নিজে সমাধান করতে পারে না, তখন একনিষ্ঠভাবে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার প্রতিপালকের কাছে সাহায্য চায়, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য; যদিও সে আজীবন তার প্রতিপালককে অস্বীকার করুক এবং মূর্তির উপাসনা করে যাক। কারণ এটা এমন এক ধরণের প্রয়োজন যা প্রতিহত করা যায় না। এটাকে স্বীকার করতেই হয়। এমনকি জীব - জন্তুর উপরেও কোন বিপদ আসলে তারা আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকায়। নিচের আয়াগুলোতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ ধরণের বিপদগ্রস্থ মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন, যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে দ্রুত মুক্তির জন্য সাহায্য চায়।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً (الزمر: ٨)

অর্থাৎঃ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি তাঁর পক্ষ হতে অনুগ্রহ করেন, তখন সে ইতিপূর্বে যার জন্যে তাঁকে ডেকেছিল তা ভুলে যায় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৮)

মহান আল্লাহ মুশরিকদের অবস্থা তুলে ধরে এরশাদ করেনঃ

{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (يونس:٢٢ – ٢٣)

অর্থাৎঃ তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে পরিভ্রমণ করান; এমনকি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলো লোকদের নিয়ে অনুকূল বাতাসের সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচণ্ড (প্রতিকূল) বাতাস এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, (হে আল্লাহ) যদি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। অনন্তর আল্লাহ যখন তাদের উদ্ধার করে নেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহচারণ করতে থাকে, হে মানব সম্প্রদায়! (শুনে রেখো) তোমাদের বিদ্রোহচারণ তোমাদেরই নিজেদের জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে (এর দ্বারা কিছু) ফলভোগ করছো, তারপর আমারই

নিকট তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। এরপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ২২- ২৩)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (لقمان:٣٢)

অর্থাৎঃ আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে মেঘমালার মত আচ্ছন্ন করে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে, আর বিশ্বাসঘাতক, অকৃজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (সূরা লোকমান ৩১ ঃ ৩২)

এই মহান প্রতিপালক যিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্বহীন থেকে, আর মানুষকে তৈরী করেছেন সুন্দর গঠন দিয়ে এবং তার ফিতরাতে স্থাপন করেছেন তাঁর দাসত্ব ও আত্মসমর্পণ করার বিশেষ যোগ্যতা। সকল বিবেক তাঁর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের আনুগত্য করেছে এবং সমস্ত উম্মত তাঁর রুবুবিয়্যাতকে একবাক্যে মেনে নিতে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে একজনই সত্তা হওয়া চাই। যেমনিভাবে তাঁর সৃষ্টিতে কোন অংশীদার নেই, তেমনিভাবে তাঁর উলুহিয়্যাতেও কোন ভাগীদার নেই। এর প্রমাণ অনেক। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হলো– (শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রচিত "কিতাবুত তাওহীদ।")

(১) এই পৃথিবীতে প্রকৃত মা'বূদ শুধুমাত্র একজনই আছেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। আর যদি এই পৃথিবীতে অন্য আরেকজন মা'বূদ থাকত তবে তারও কাজ, সৃষ্টি ও নির্দেশাবলী থাকত। এতে করে একজন অন্যজনের অংশগ্রহণকে মেনে নিতে পারতো না। (শারহু আক্বীদাহ আত ত্বহাবিয়াহ ঃ ৩৯) তদুপরি একজনের শক্তি ও ক্ষমতা অন্যজনের চেয়ে বেশী থাকত। অক্ষম ও পরাস্ত কক্ষনো মা'বূদ হতে পারে না। তিনিই প্রকৃত মা'বূদ যিনি ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী। যার ইবাদতে কোন মা'বূদ অংশীদার হতে পারে না যেমনিভাবে তাঁর রুবুবিয়্যাতে কোন অংশীদার নেই। মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (المؤمنون:٩١)

অর্থাৎঃ আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। আর তাঁর সাথে অপর কোন মা'বূদ নেই; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক মা'বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো; তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। (সূরা মুমিনূন ২৩ ঃ ৯১)

(২) ইবাদতের হক্বদার কেবল আল্লাহ তা'য়ালা। যিনি আকাশ ও যমীনের মালিক। কেননা মানুষ এমন মা'বূদের নৈকট্য অর্জন করতে চায়, যিনি তার সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারেন এবং যাবতীয় দুঃখ, দুর্দশা ও অনিষ্ট দূরীভূত করার ক্ষমতা রাখেন। আর এটা সেই মহান সত্তার পক্ষেই সম্ভব যিনি আকাশ ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তার সব কিছুর মালিক। যদি তাঁর সঙ্গে একাধিক মা'বূদ থাকতো যেমনটি মুশরিকদের ধারণা, তবে বান্দাগণ সত্য প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য একাধিক পথ আঁকড়ে ধরতো; কারণ এ সকল মা'বূদগুলো শুধুমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করত ও তাঁরই নৈকট্য অর্জনে স্বচেষ্ট থাকত। সুতরাং যার হাতে কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবিকাঠি, এমন সত্য সত্তার যে নৈকট্য লাভ করতে চায়, তাকে সত্য মা'বূদ আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। যার ইবাদত করে থাকে আকাশ, যমীন এবং এতদুভয়ের সকল মাখলুকাত। আর এসব অসত্য মা'বূদগুলো এদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (الاسراء:٤٢)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ) আপনি বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে আরো মা'বূদ থাকতো তবে তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার উপায় অন্বেষণ করতো। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৪২)

সত্য সন্ধানীর নীচের আয়াতগুলো পড়া উচিত–

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي لسَّمَاوَاتِ

وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ - وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَه} (سبأ:٢٢- ٢٣)

অর্থাৎঃ বলুনঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ মনে করতে, তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ নেই এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়। আর যাকে অনুমতি দেয়া হয় তার ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না। (সূরা সাবা ৩৪ ঃ ২২-২৩)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে গাইরুল্লাহর সাথে অন্তরের সম্পর্ককে চারটি বিষয় দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এসব অংশীদারগণ আল্লাহর সাথে বিন্দু পরিমাণ বস্তুর মালিক না। আর যে বিন্দু পরিমাণ বস্তুর মালিক না সে কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। সে মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয় এবং আল্লাহর সঙ্গে কোন কাজে অংশীদারও নয়; বরং মহান আল্লাহ তা'য়ালাই তাদের মালিক এবং তাদের দেখাশুনা করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ তারা আকাশ ও যমীনের কোন অংশের মালিক নয় এবং উভয়ের মাঝে তাদের তিল পরিমাণ অংশীদারিত্বও নেই।

তৃতীয়তঃ সৃষ্টির কেউ মহান আল্লাহকে সাহায্য করতে পারে না। বরং তিনিই তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। যেমন তিনি তাদের যাবতীয় কল্যাণ সাধন করেন এবং সব অকল্যাণ দূরীভূত করেন। তিনি অমুখাপেক্ষী এবং সৃষ্টির সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

চতুর্থতঃ এসব অংশীদারগণ তাদের অনুসারীদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফাআতের অধিকার রাখে না। কারণ তাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। সুপারিশের অনুমতি কেবল আল্লাহ তা'য়ালার ওলীদের জন্য নির্ধারিত।[২] তবে এসব ওলীগণ তাদের জন্যই সুপারিশ করতে

২. এখানে ওলী বলতে যারা মুত্তাকী, পরহেযগার বান্দা এবং শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও হালাল-হারাম মেনে চলেন তারাই উদ্দেশ্য, বর্তমান সমাজে শিরক-বিদআতের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত একশ্রেণীর নামধারী কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী ও কবর পুজারী পীর উদ্দেশ্য নয়। অনুবাদক।

পারবে, যাদের কথা, কাজ ও আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট। (শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান রাহেমাহুল্লাহ প্রণীত "কুররাতু উয়ুনুল মুওয়াহহিদীন" ১০০)

(৩) সুশৃংখল পৃথিবী এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনাই প্রমাণ করে যে, এর পরিচালক মাত্র একজন। তিনি ছাড়া সৃষ্টির আর কোন মা'বূদ ও পরিচালক নেই। সুতরাং যেমনিভাবে দু'জন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনিভাবে দু'জন বা ততোধিক মা'বুদের অস্তিত্বও ভাবা অমূলক। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (الانبياء:٢٢)

অর্থাৎঃ যদি আল্লাহ ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু মা'বূদ থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত; অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২২)

সুতরাং আকাশ ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কোন মা'বূদ থাকতো, তবে অবশ্যই বিশৃংখলা দেখা দিত। আর এই বিশৃংখলার প্রধান কারণ হলো; যদি আল্লাহর সঙ্গে অন্য অন্য কোন মা'বূদ থাকতো, তবে অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতা ও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের চেয়ে শক্তিশালী হতো। আর এতে ঝগড়া ও মতভেদ তৈরী হতো এবং ফেতনা-ফাসাদের আবির্ভাব ঘটত। (ফাতহুল ক্বাদীর ঃ ৩য় খণ্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

যদি একটি দেহ বা শরীরের পরিচালনার দায়িত্ব একই রকম দু'টি আত্মার থাকতো, তবে দেহ ধ্বংস হয়ে যেত। যদি এটা অসম্ভব হয়, তাহলে এই বিশাল পৃথিবীর ক্ষেত্রে দু'জন বা ততোধিক পরিচালক কিভাবে কল্পনা করা যায়!

(৪) সমগ্র নবীগণের ইজমা' ঃ إجماع الأنبياء

সকল উম্মতগণ একমত যে, নবী ও রাসূলগণ হলেন পূর্ণ বিবেকবান মানুষ, পূত পবিত্র, সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী, তাদের অধিনস্তদের কল্যাণকামী, আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা সম্পর্কে সব চেয়ে বেশী জ্ঞাত এবং সঠিক ও সরল পথের সন্ধান দানকারী। কেননা তারা সরাসরি মহান আল্লাহর নিকট থেকে ওহীপ্রাপ্ত হন, তারপর তা মানুষের মাঝে প্রচার

করেন। প্রথম নবী আদম (عليه السلام) হতে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) পর্যন্ত সবাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিয়েছিলেন। কেননা তিনিই প্রকৃত মা'বূদ। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبياء:٢٥)

অর্থাৎঃ আমি আপনার পূর্বে যে সকল নবীকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের প্রত্যেককে এই ওহী করি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৫)

আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (عليه السلام)-এর তাওহীদের কথা উল্লেখ করেন; তিনি তার উম্মতকে বলেছিলেন যে–

أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (هود:٢٦)

অর্থাৎঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না, আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। (সূরা হুদ ১১ ঃ ২৬)

শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, তিনি তার উম্মতকে বলেছিলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (الانبياء:١٠٨)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ) আপনি বলুনঃ আমার প্রতি ওহী হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ শুধুমাত্র একজনই, সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে? (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ১০৮)

এই মহান মা'বূদ যিনি এই পৃথিবীকে অসাধারণ রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সুন্দর গঠন দিয়ে তৈরি করে সম্মানিত করেছেন এবং তার ফিতরাতে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে স্বীকৃতি দেয়ার যোগ্যতা স্থাপন করেছেন। তিনি তার আত্মাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, মহান আল্লাহর অনুগত না হলে, তাঁর নির্দেশ মত না চললে স্থির থাকে না। আর

তার রূহের জন্য ধার্য করেছেন যে, সে কখনও প্রশান্তি লাভ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিকর্তার নিকট আশ্রয় না নেবে এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা না করবে। আর তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা কেবল তাঁর সঠিক পথ গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। যার প্রচার ও প্রসার করেছিলেন সম্মানিত রসূলগণ। আর তিনি মানুষকে আরেকটি মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন, তা হলো বিবেকশক্তি। তার যাবতীয় কার্যাবলী তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন সে তার রবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে। সুতরাং ফিতরাত সঠিক হলে রূহ (আত্মা) প্রশান্তি লাভ করবে, নফস বা মন স্থির হবে এবং বিবেক ঈমান আনবে, আর তখন একজন মানুষের পক্ষে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অর্জন সম্ভব হবে। আর মানুষ যদি এগুলো অস্বীকার করে, তবে পৃথিবীর অলিতে-গলিতে পাগলের মত উম্মাদ হয়ে জীবন যাপন করবে। অনেক প্রভুর মাঝে বিলিন হয়ে যাবে। অর্থাৎ এক প্রভুর ইবাদত করে সন্তুষ্ট হতে পারবে না। ফলে সে জানতে পারবে না, কে তার উপকার করবে আর কেই বা তার বিপদ দূর করবে। আত্মার মধ্যে ঈমানকে স্থির করতে এবং কুফরের নোংরামি প্রকাশ করার জন্য মহান আল্লাহ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, কেননা উদাহরণের মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট হয়। এর মধ্যে দু'জন লোকের মাঝে তুলনা করা হয়; একজন তার কাজ কর্ম বহু প্রভুর মাঝে বন্টন করে (বহু প্রভুর ইবাদত করে) আর অন্যজন শুধুমাত্র এক প্রভুর ইবাদত করে তারা কি সমান? কখনই না। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر:٢٩)

অর্থাৎঃ আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। এক ব্যক্তির মালিক অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির মালিক শুধু একজন; এই দু'জনার অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য; কিন্তু অধিকাংশই এটা জানে না। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ২৯)

আল্লাহ তা'য়ালা অত্র আয়াতে তাওহীদপন্থী বান্দা ও মুশরিক বান্দার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন; এক ব্যক্তির মালিক অনেকগুলো। সবাই তাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করে, নিজের অনুগত বলে দাবী করে, সে তাদের মাঝে

বিভক্ত, তাদের প্রত্যেকেই তার উপর নিজের দিক-নির্দেশনা ও দায়িত্ব অর্পণ করতে চায়। এমতাবস্থায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং এক পথ বা মতের উপর চলতে পারে না। ফলে সে তাদের ঝগড়াটে, বিতর্কপূর্ণ ও স্ববিরোধী প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এতে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও শক্তি সামর্থ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। অপরপক্ষে অন্য একজন বান্দা যার মালিক শুধুমাত্র একজন, সে জানে যে তার মালিক তার থেকে কী চায় এবং কী দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে। এতে করে সে সুস্পষ্ট এক নীতির উপর স্থির থাকতে পারে। সুতরাং আলোচিত দু'জন বান্দা একসমান নয়। ফলে একজন এক মালিকের

অনুগত হয়ে সততা, জ্ঞান ও নিশ্চয়তার প্রশান্তি লাভ করে। আর অপরজন পরস্পর বিরোধী অনেকগুলো মালিকের ইবাদত করে অতিষ্টপূর্ণ জীবন যাপন করে। কোন অবস্থায় স্থির থাকতে পারে না। তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করা তো দূরে থাক, বরং তাদের একজনকেও সে সন্তুষ্ট করতে পারে না। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের বিষয়টি যখন প্রমাণিত হলো, তখন আমাদের জানা দরকার এই বিশ্বপরিমণ্ডল ও মানব সৃষ্টির অজানা কারণ ও রহস্য।

মহাজগতের সৃষ্টি

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই বিশাল পৃথিবীকে তার আকাশ, যমীন, নক্ষত্র, সমুদ্র, গাছপালা ও সমস্ত প্রাণীজগতসহ সৃষ্টি করেছেন কোন অস্তিত্ব ছাড়াই। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ - وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ - ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ - فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (فصلت:٩ - ١٢)

অর্থাৎঃ আপনি বলুনঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আর তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি যমীনের উপর পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তিনি তাতে মাত্র চার দিনের মধ্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। জিজ্ঞাসুদের জন্যে (এতে উত্তর) রয়েছে সমভাবে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্র বিশেষ। তারপর তিনি ওকে ও পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায়। তখন তারা বললঃ আমরা অনুগত হয়ে আসলাম। অতঃপর তিনি দুই দিনে সাত আকাশ বানালেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার উপযুক্ত বিধান ব্যক্ত করলেন। আর আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত করলাম। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞাত আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (সূরা হা-মীম-আসসাজদাহ ৪১ ঃ ৯-১২)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ - وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ - وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (الانبياء:٣٠ -٣٢)

অর্থাৎঃ যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং পানি হতে প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? আর আমি এই পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি অনেক প্রশস্ত রাস্তা, যাতে করে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। আর আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা এ সমস্ত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৩০-৩২, আরো দেখুন সূরা রা'দের প্রথম দিকের আয়াতগুলো)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই বিশাল বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য মহান হেকমত দিয়ে, যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এর প্রতিটি

অংশেই মহান হিকমতে ভরপূর। আপনি যদি এর, যে কোন একটি নিদর্শন নিয়ে ভাবেন, তবে তাতে অনেক আশ্চর্যের বিষয় খুঁজে পাবেন। আপনি বৃক্ষলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালার কারুকার্যতার দিকে দেখুন; যার একটি পাতা, শেকড় ও ফল অপকারী নয়। কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তি ওগুলোকে বিস্তারিত আবিষ্কার করতে অক্ষম। আর সেই নরম, ক্ষীণ ও দুর্বল শিকড় যেগুলোকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকলে দেখা যায় না, সেগুলোতে পানির গতিপথের দিকে তাকিয়ে দেখুন! কিভাবে সেগুলো নিচ থেকে উপরে পানি টেনে শক্তিশালী হচ্ছে। তারপর শিকড়গুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা অনুসারে পানি স্থানান্তরিত হতে থাকে। এরপর শিকড়গুলো বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এমন এক সীমায় পৌঁছে যে, দৃষ্টি দিয়ে তা দেখা সম্ভব হয় না। আপনি গাছের চারা গঠন ও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে দেখুন! সেটা যেন দৃষ্টির আড়ালে লুক্কায়িত গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থার পরিবর্তনের মত। পক্ষান্তরে আপনি তাকে দেখবেন বস্ত্রহীন একটি জ্বালানী কাঠের মত। তারপর তার প্রতিপালক ও স্রষ্টা আল্লাহ পাতার সুন্দর পোশাক পরিধান করান। দুর্বল চারা সংরক্ষণের জন্য এবং অপরিপক্ক ফল-ফলাদির পোশাক হিসেবে পাতা বের করেন, যাতে করে সেগুলো পাতার মাধ্যমে গরম, ঠাণ্ডা ও বিভিন্ন প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। অতঃপর ওর ভিতর থেকে দুর্বল ও ক্ষীণাকারে অঙ্কুর প্রস্ফুটিত করেন। তারপর ঐ সমস্ত ফল-ফলাদির খাদ্য-খোরাক তিনি গাছের শিকড় ও গতিপথে চালিয়ে দেন। ফলে সেখান থেকে তারা খাদ্য আহরণ করতে থাকে যেমনিভাবে শিশু তার মায়ের দুগ্ধ থেকে খাদ্য আহরণ করে। এভাবে মহান আল্লাহ তাকে খাদ্য যোগিয়ে প্রতিপালন ও বড় করতে থাকেন। অবশেষে যখন তা পরিপক্ক হয়ে খাবারের উপযোগী হয়, তখন তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সেই বোবা জড় কাঠ হতে টাটকা সুস্বাদু ফল রিযিক হিসেবে দান করেন।

আর আপনি যদি যমীনের কথা ভাবেন, ওকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে দেখতে পাবেন; সেটা মহান সৃষ্টিকর্তার এক বড় নিদর্শন। তিনি যমীনকে বিছানা ও বিশ্রামস্থল হিসেবে তৈরী করেছেন এবং বান্দাদের জন্য তা অনুগত করে দিয়েছেন। এর মাঝেই তিনি তাদের রিযিক, খাদ্য এবং জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ রেখে দিয়েছেন। আর তাতে

বানিয়েছেন অনেকগুলো পথ, যাতে করে তারা সব ধরণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে সহজেই চলাফেরা করতে পারে। আর তাতে পাহাড় পর্বত স্থাপন করে মজবুত করেছেন, যাতে করে তা নড়া চড়া করতে না পারে। যমীনের বক্ষকে করেছেন বিস্তৃত। একে বিছিয়ে প্রসারিত করেছেন। এর উপরিভাগকে করেছেন জীবিতদের মিলনমেলা এবং অভ্যন্তরভাগকে মৃতদের জন্য একত্রিত হওয়ার জায়গা। অর্থাৎ উপরিভাগ হলো জীবিতদের এবং অভ্যন্তর ভাগ হলো মৃতদের বাসস্থান। তারপর খেয়াল করুন চলমান কক্ষপথের দিকে– কিভাবে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী নিয়ে সুশৃংখলভাবে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এর ভাঁজেই আছে রাত-দিনের, ঋতুসমূহের এবং গরম-ঠাণ্ডার বিবর্তন। আর এর মধ্যে আছে যমীনের সকল জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি, গাছ-পালা ও তৃণলতার নানা ধরণের উপকার।

আকাশের সৃষ্টি নিয়ে ভাবুন, বারবার দৃষ্টি ফেরান, তাহলে দেখতে পাবেন; তা উচ্চতায়, প্রশস্ততায় ও স্থিরতায় আল্লাহ তা'য়ালার বড় একটি নিদর্শন। যার নিচে কোন খুঁটি নেই এবং উপরের কোন কিছুর সাথেও সম্পৃক্ততা নেই; বরং আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতায় তা ঝুলন্ত আছে। যিনি আকাশ ও যমীনকে ধরে রেখেছেন, যাতে করে তা বিলুপ্ত না হয়ে যায়। আপনি যদি এই পৃথিবী এবং এর অংশগুলোর গঠন ও সুন্দর পন্থায় বিন্যাসের দিকে তাকিয়ে দেখেন! "যা তার সৃষ্টিকর্তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, জ্ঞান, হেকমত ও সৌন্দর্যের প্রতীক" তাহলে আপনি এটিকে তৈরীকৃত একটি বাড়ীর মত পাবেন। যেখানে সব ধরণের যন্ত্রপাতি, উপকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে। আকাশ যেন এই পৃথিবী নামক গৃহের ছাদ, আর যমীন পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য বিছানা এবং বিশ্রামাগার ও বাসস্থান। সূর্য ও চন্দ্র দু'টি প্রদীপ হয়ে আলো দিচ্ছে, আর নক্ষত্ররাজি তার লাইট ও সৌন্দর্য বর্ধণের যন্ত্র। এগুলো এই আস্তানার পথিককে পথ দেখায়। আর প্রস্তুতকৃত সম্পদের মত এর ভিতর লুকিয়ে থাকা মণি মাণিক্য-জহরত ও খনিজ সম্পদ ধনভাণ্ডার তুল্য। এসব কিছু তার কল্যাণের জন্য। বিভিন্ন ধরণের গাছ-পালা, তৃণলতা তার প্রয়োজনে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নানান জাতের জীব-জানোয়ার তার সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য। এগুলোর কিছু আছে আরোহনের, কিছু দুগ্ধবতী, কিছু গোস্ত

খাওয়ার, কিছু যার চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরীর এবং কিছু আছে প্রহরীর কাজ করে। আর এ ক্ষেত্রে মানুষকে করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক এবং কাজ কর্ম ও হুকুমের কর্তৃত্বকারী। আপনি যদি সমগ্র পৃথিবী অথবা এর একটি অংশ নিয়ে ভাবেন, তাহলে এতে আশ্চর্য ধরণের সব জিনিস দেখতে পাবেন। পূর্ণ মনোযোগের সাথে যদি দেখেন, সুবিচার করেন এবং প্রবৃত্তি ও অন্ধ অনুকরণের জাল থেকে মুক্ত থাকেন, তবে সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারবেনঃ এই পৃথিবী হল সৃষ্ট। মহা প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাধর, মহাজ্ঞানী আল্লাহ এর সৃষ্টিকর্তা। সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে তিনি একে তৈরী করেছেন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা দু'জন হবে– এটা অসম্ভব; বরং মা'বূদ একজনই, তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। যদি আকাশ ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ থাকতো, তাহলে বিশৃংখলা দেখা দিত, নিয়ম-শৃংখলা নষ্ট হয়ে যেত, সব ধরণের কল্যাণমূলক কাজ থেমে যেত। আর যদি অস্বীকার করে সৃষ্টিকে তার স্রষ্টা ছাড়া অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন, তাহলে নদীতে রাখা সেচ যন্ত্রের ব্যাপারে কী বলবেন; যার যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত সুদৃঢ়, যন্ত্রগুলো সুন্দরভাবে যথাস্থানে স্থাপন করে অত্যন্ত মজবুত করে গঠন করা হয়েছে। কোন দর্শক তার গঠনে ও আকৃতিতে কোন ত্রুটি খুঁজে পায় না। এরপর তা বিশাল একটি বাগানের সাথে সংযোগ দেয়া হয়। যাতে নানা ধরণের ফলফলাদি আছে। প্রয়োজন অনুসারে সে তাতে পানি সরবরাহ করে। আর ঐ বাগানের সার্বিক দেখাশুনা, পরিচর্যা এবং যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজকর্ম করার জন্য লোক আছে। ফলে সেখানে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না এবং তার ফলও নষ্ট হয় না। অতঃপর ফল কাটার সময় তার মূল্য প্রত্যেক উৎসের যা প্রয়োজন ও সমীচীন সে মোতাবেক বন্টন করা হয়। সর্বদাই এভাবে বন্টন করা হয়ে থাকে। আপনি কি মনে করেন; এগুলো সব কোন মালিক ও পরিচালক ছাড়াই হঠাৎ আপনা আপনি হয়েছে? বরং সেই সেচ যন্ত্র ও বাগানের অস্তিত্ব এবং অন্যান্য যা কিছু আছে সব কি কোন কর্তা ও পরিচালক ছাড়া হঠাৎ ঘটেছে? আপনি কি ভেবে দেখেছন; এটা যদি হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনার বিবেক আপনাকে কী বলে? কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করছে? কে আপনাকে সেদিকে পথ দেখাচ্ছে? (এই অংশটি 'মিফতাহু দারুস সাআ'দাহ' ১ম খণ্ডের ২৫১-২৬৯ নং পৃষ্ঠার বিভিন্ন স্থান হতে চয়ন করা হয়েছে)

মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য

সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর আল্লাহ তা'য়ালা এই বিশাল সৃষ্টিজগত ও সুন্দর সুন্দর নিদর্শনাবলী যে কারণে সৃষ্টি করেছেন, তার কিছু হিকমত ও রহস্য উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে করছি। যেমনঃ

(১) মানুষের অধীনস্ত ও সেবায় নিয়োজিত করাঃ

মহান আল্লাহ যখন এই পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে করে সেখানে তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং পৃথিবীকে আবাদ করবে, তখন তিনি তাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন। যাতে করে তাদের ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কাজ কর্ম সঠিক ও সুন্দর হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ [الجاثية: ١٣]

অর্থাৎঃ আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন যা আছে আকাশে আর যা আছে যমীনে সেগুলোর সব কিছুকে। (সূরা জাসিয়া ৪৫ ঃ ১৩)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ [إبراهيم : ٣٤] [إبراهيم : ٣٢ – ٣٤]

অর্থাৎঃ তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্যে ফল-মূল উৎপাদন করেন। তিনি নৌযানকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে ওটা সমুদ্রে চলাচল করে এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের

কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছো তা হতে; তোমরা আল্লাহর নেয়া'মত গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৩২-৩৪)

(২) আকাশ ও যমীনসহ সবকিছুকে আল্লাহ তা'য়ালার রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের উপর সাক্ষী ও নিদর্শন বানানঃ

কারণ, এই অবস্থানে পৃথিবীর সব চেয়ে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; তাঁর রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করা এবং তাঁর এককত্বের উপর বিশ্বাস আনা। আর বিষয়টি যেহেতু বড় তাই মহান আল্লাহ এর উপর বৃহৎ সাক্ষী ও বড় নিদর্শনকে পেশ করেছেন এবং অধিক জোরদার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তাই আল্লাহ তা'য়ালা আকাশ ও যমীনসহ সবকিছুকে এর সাক্ষী বানিয়েছেন। যার কারণে পবিত্র কুরআনে তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরো হল যা অনেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে; যেমন নিম্নের আয়াতগুলোতে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ - وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ - وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ [الروم : ٢٢ –٢٥]

অর্থাৎঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হল; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন; ভয় ও ভরসা সঞ্চারক রূপে এবং তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন ও তার দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। এবং তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমেই দাঁড়িয়ে আছে। (সূরা রূম ৩০ ঃ ২২-২৫)

(৩) পুনরুত্থানের উপর সাক্ষী বা প্রমাণস্বরূপঃ

মানুষের জীবন দু'ভাগে বিভক্ত; দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন। আর আখেরাতের জীবনই হল প্রকৃত জীবন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [العنكبوت: ٦٤]

অর্থাৎঃ আর এই পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই হল প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো। (সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ ৬৪)

কেননা পরকাল হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জায়গা এবং সেখানে জন্নাতীরা জান্নাতে চির অধিবাসী হবে এবং জাহান্নামীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আর আখেরাতের এই জীবনে মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়েই কেবল আসতে পারবে। তাই যারাই তার প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে (অর্থাৎ নাস্তিক) এবং যাদের জন্মগত আকীদা ও বিবেকশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে তারাই পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করে। এ কারণেই আল্লাহ অগণিত দলীল-প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন; যাতে করে আখেরাত দিবসের প্রতি সবাই দৃঢ় বিশ্বাস আনে। কারণ কোন কিছু প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে তাকে পুনরায় করা অতি সহজ। বরং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে আকাশ ও যমীনকে সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الروم : ٢٧]

অর্থাৎঃ তিনি সৃষ্টিকে প্রথম সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; আর এটা তার জন্যে অতি সহজ। (সূরা রূম ৩০ ঃ ২৭)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ [غافر: ٥٧]

অর্থাৎঃ মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবশ্যই অনেক বড় কাজ। (সূরা গাফির বা মু'মিন ৪০ ঃ ৫৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ [الرعد: ٢]

অর্থাৎঃ আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছো; অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুবর্তী করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে পার। (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ২)

অতএব হে আদম সন্তান! আপনার কল্যাণ সাধনের জন্যই যখন এই পৃথিবীর সব কিছু অনুগত করা হয়েছে এবং তাঁর নিদর্শনাবলী ও দৃষ্টান্ত বলীকে প্রামানিক সাক্ষ্য হিসেবে আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তাহলে আপনি এই সাক্ষ্য প্রদান করুন যে; "আল্লাহ ছাড়া সত্য আর কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই"।

আপনি যখন জানলেন যে, মৃত্যুর পর আপনার পুনরুত্থান ও জীবন লাভ করা আকাশ ও যমীন সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক সহজ এবং আপনার প্রতিপালকের সাথে আপনার সাক্ষাত হবে, তিনি আপনার সকল কর্মের হিসাব নেবেন। আরো যখন জানতে পারলেন যে, এই সমগ্র পৃথিবীটা তার প্রতিপালকের ইবাদত করছে, অতএব সমগ্র সৃষ্টিকুল তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ [الجمعة: ١]

অর্থাৎঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে আল্লাহর, যিনি মহা অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (সূরা জুমুআহ ৬২ ঃ ১)

তাঁর বড়ত্বের কারণে সব কিছু তাঁকে সেজদা করে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ [الحج: ١٨]

অর্থাৎঃ আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা সবাই আল্লাহকে সেজদা করে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু। আর সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ১৮)

বরং এই সৃষ্টিজগত তাঁর রবের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে থাকে, যেমনটি তাঁর জন্য যথাযথ হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ [النور: ٤١]

অর্থাৎঃ আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা এবং উড্ডীয়মান পাখিসমূহ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তাঁর নামায ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৪১)

আর যখন আপনার সমস্ত শরীর আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম ও পরিচালনা অনুযায়ী নিজ গতিতে চলছে; যেমন অন্তর, দু'টি ফুসফুস, কলিজা এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণকারী,

যারা তাদের পরিচালনার দায়িত্বভার তাঁদের রবের নিকট সমর্পণ করেছে। সুতরাং আপনার ঐচ্ছিক স্বীকৃতিকে কি আপনার রবের প্রতি বিশ্বাস আনা আর না আনার মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি? এই স্বীকৃতি কি এই পৃথিবীতে যারা আপনার চারপাশে আছে, বরং আপনার শরীরে যা আছে তাদের থেকে হবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম? একজন পূর্ণ জ্ঞানী মানুষ এই বিশাল পৃথিবীর মাঝে কখনই সবার থেকে ব্যতিক্রম হতে চাইবে না।

মানব সৃষ্টি ও তার মর্যাদা

এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা উপযুক্ত একটি জাতি সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই জাতি হলো মানব সম্প্রদায়। আর আল্লাহর হিকমতের দাবি, তিনি মানুষকে যে ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করবেন তা হবে মাটি। তাই তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেন। তারপর তিনি এই সুন্দর আকৃতি দিয়ে তাকে গঠন করলেন, যে আকৃতিতে মানুষ এখন জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর যখন তার আকৃতি পরিপূর্ণ হলো, তখন তিনি তার মধ্যে আত্মা দিলেন। ফলে যখন মানুষ সুন্দর আকৃতি পেয়ে শুনতে, দেখতে, নড়াচড়া করতে ও কথা বলতে আরম্ভ করল তখন তাঁর প্রভু তাঁকে জান্নাতে বসবাস করতে দিলেন। আর তার যা জানা প্রয়োজন সব তাকে শিক্ষা দিলেন। জান্নাতের সব কিছু তার জন্য বৈধ করে দিলেন এবং পরীক্ষা করার জন্য একটি মাত্র গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন। অনন্তর আল্লাহ তা'য়ালা তার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করতে চাইলেন। তাই ফেরেশতাদেরকে তার জন্য সেজদা করার নির্দেশ দিলেন। সকল ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে সেজদা করল; কিন্তু একমাত্র ইবলিস অহঙ্কার ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়ে সেজদা করা হতে বিরত থাকল। আদেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং অহঙ্কারের জন্য তিনি তাঁর রহমত হতে তাকে বঞ্চিত করলেন। এরপর ইবলিস আল্লাহর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত বৃদ্ধি করার জন্য প্রার্থনা করল। তিনি তার এই প্রার্থনা কবুল করে তার আয়ুষ্কাল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন।

আদম (عليه السلام) ও তার বংশধরদের মান-মর্যাদা দেখে ইবলিস শয়তান হিংসায় ফেটে পড়ল এবং সে তার রবের শপথ করল; সমস্ত বানী আদমকে সে পথভ্রষ্ট করবে। তাই পথভ্রষ্ট করার জন্য সে তাদের সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে সর্বদিক থেকে তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। কেবলমাত্র আল্লাহর একনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও মুত্তাকী বান্দাদেরকে সে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা আদম (عليه السلام)-কে শয়তানের চক্রান্তে পতিত হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু শয়তান আদম (عليه السلام) ও তার স্ত্রী হাওয়া-কে জন্নাত হতে বিতাড়িত করার জন্য এবং তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের পরস্পরের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য তার কুমন্ত্রণার জালে আবদ্ধ করল। সে তাদের সামনে শপথ করে বললঃ আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এই গাছের ফল খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরকাল জান্নাতী হয়ে যাবে; মূলত এ কারণেই আল্লাহ তোমাদেরকে ঐ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। ফলে মিথ্যা কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন। তাই নির্দেশ অমান্য করার কারণে প্রথম শাস্তি হিসেবে তারা বস্ত্রহীন হয়ে পড়লেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক করার ব্যাপারটি তিনি তাদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। আদম (عليه السلام) তার ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তার তওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তিনি তাকে নাবী হিসেবে মনোনীত করেন ও হেদায়েত দান করেন। আর দ্বিতীয় শাস্তি হিসেবে তিনি তাকে জান্নাত হতে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ দিলেন। কেননা এটাই তার বাসস্থান। এখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন কাল অতিবাহিত করতে হবে। আর তিনি তাকে জানিয়ে দেন যে, এ যমীন তথা মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এখানে জীবন যাপন করবে, এখানেই মৃত্যুবরণ করবে, অবশেষে কিয়ামত দিবসে এই যমীন থেকেই পুনরায় উঠানো হবে। অতঃপর আদম (عليه السلام) ও তার স্ত্রী হাওয়া আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন এবং বসবাস শুরু করলেন। তাদের বংশ বিস্তার লাভ করল। তারা সবাই আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর ইবাদত করতেন। আর আদম (عليه السلام) ছিলেন আল্লাহর নবী।

আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত সংবাদের বর্ণনা দিয়ে এরশাদ করেনঃ

{وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) } [الأعراف: ١١ - ٢٥

অর্থাৎঃ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি, তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি– তোমরা

আদমকে (عليه السلام) সেজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সেজদা করল, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলিসকে) জিজ্ঞেস করলেন: আমি যখন তোমাকে আদমকে সেজদা করতে আদেশ করলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে সেজদা করা হতে নিবৃত্ত করলো? সে উত্তরে বললঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি হতে। আল্লাহ বললেনঃ এ স্থান থেকে নেমে যাও! এখান থেকে তুমি অহঙ্কার করবে এটা হতে পারে না; সুতরাং বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি নীচ ও লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললঃ (হে আল্লাহ) আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (বেঁচে থাকার) অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেনঃ (ঠিক আছে) তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। সে বললঃ আপনি যে কারণে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমিও শপথ করে বলছিঃ আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য আপনার সরল পথে অবশ্যই ওঁৎ পেতে বসে থাকব। অতঃপর আমি পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসবো, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না। আল্লাহ বললেনঃ তুমি এখান হতে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যাও। তাদের (বানী আদমের) মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো। আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তাই খাও; কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়বে। অত:পর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, আর বললঃ তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরশতা হয়ে না যাও অথবা (এই জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পার। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললঃ আমি তোমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং সে (ইবলীস) তাঁদের উভয়কে প্রতারণা ও ছলনা দ্বারা নীচে নিয়ে আসল (বিভ্রান্ত করল)। ফলে যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের স্বাদ গ্রহণ করে ফেলল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং জন্নাতের গাছের পাতা দ্বারা

নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। এ সময় তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষ হতে নিষেধ করিনি? আর শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তা কি তোমাদেরকে বলিনি? তখন তারা বললঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। আল্লাহ বললেনঃ তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে এখান থেকে নেমে যাও, তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসবাস করা এবং তথায় জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরো বলেনঃ সেই পৃথিবীতে তোমরা জীবন-যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং তথা হতেই তোমাদেরকে বের করা হবে। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১১-২৫)

আপনি যখন আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির এই মহান বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন, তখন দেখতে পাবেন; আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর মর্যাদার যাবতীয় সম্মানসূচক পোশাক তাকে দান করেছেন। যেমন; বিবেকশক্তি, জ্ঞান, প্রকাশ করার শক্তি, কথা বলার শক্তি, সুন্দর গঠন ও আকৃতি, মাঝারী শরীর, যুক্তি ও বিবেচনা শক্তি দিয়ে জ্ঞানার্জনের দক্ষতা এবং উত্তম চরিত্র যেমন; সততা, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। সুতরাং সে যখন মায়ের গর্ভের মধ্যে এক বিন্দু তুচ্ছ পানি ছিল তার সেই অবস্থার মাঝে এবং সে যখন পরিপূর্ণ সুন্দর আকৃতির মানুষ হয়ে সৎ আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আদন নামক জান্নাতবাসী হবে আর তার নিকট ফেরেশতা প্রবেশ করবে তার ঐ অবস্থার মাঝে কতই না তফাৎ! তাই তো তিনি এরশাদ করেনঃ

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون:١٤)

অর্থাৎঃ অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ১৪)

সুতরাং পৃথিবীটা একটি গ্রামের মত, আর মানুষ তার অধিবাসী। সব কিছু তার কাজে ব্যস্ত। তার যাবতীয় কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের খেদমত ও প্রয়োজনের জন্যই এসব কিছু তৈরী করা হয়েছে। তাই তার হেফাজতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ দিন-রাত

তার হেফাজতের কাজ করে যাচ্ছে। বৃষ্টি ও উদ্ভিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ তার রিযিকের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও কাজ করে যাচ্ছে। কক্ষপথসমূহকে অনুগত করা হয়েছে, তারা তার কল্যাণে চলমান। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজীকে অনুগত ও চলমান রাখা হয়েছে তার সময়ের হিসাবের জন্য এবং তার সার্বিক জীবনের স্থিতিশীলতা ঠিক রাখার জন্য। আকাশের ভাসমান জগত যেমন বাতাস, মেঘমালা, পাখি ইত্যাদিসহ তাতে যা কিছু আছে সবই তার অনুগত। নিচের সমস্ত জগতও তার অনুগত, তার কল্যাণ সাধনের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন– যমীন, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, গাছপালা, ফলমূল, তৃণলতা, জীব-জন্তু ইত্যাদি আরো যা কিছু আছে। যেমন–

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ [إبراهيم : ٣٢ ، ٣٤]

অর্থাৎঃ তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে ওটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যেক যা কিছু চেয়েছো। তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (মিফতাহু দারিস সাআ'দাহ ঃ ১ম খণ্ড; ৩২৭, ৩২৮ নং পৃষ্ঠা; সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৩২-৩৪)

মহান আল্লাহ যে মানুষকে পূর্ণ মর্যদা দান করেছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ হল যে, তিনি পার্থিব জীবনে তার প্রয়োজনীয় সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং পরকালে উচ্চ আসনে তাকে পৌঁছে দেবে এমন প্রয়োজনীয় মাধ্যমও দান করেছেন; ফলে তিনি তার কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেন, অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠান, যারা আল্লাহর বিধি-বিধান বর্ণনা করেন এবং তাঁর দিকে আহ্বান করেন। অতঃপর আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা আদম (عليه السلام)-এর জন্য তার আত্মা হতে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। এর ফলে তিনি তার নিকট আরাম, প্রশান্তি, স্থিরতা অনুভব করলেন। তিনি শুধু একা নন; বরং এমন মিলনে তারা উভয়েই পরস্পরের মাঝে প্রশান্তি, তৃপ্তি, ভালবাসা, ও অনুকম্পা অনুভব করলেন। কেননা উভয়ের শারীরিক, আত্মিক ও স্নায়ুবিক সেতু বন্ধনের মাঝে এক ধরণের সাড়া পরিলক্ষিত হয় এবং একজনের অনুপস্থিতি অন্যজনের মধ্যে খেয়াল করা যায়। তাদের ভালবাসা ও ঐক্য শুধুমাত্র একটি নতুন প্রজন্ম গঠনের জন্য। এই সমস্ত আবেগ, অনুভূতি তাদের দু'টি আত্মাকে একত্রিত করেছে এবং ঐ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই অনুভূতিগুলো আত্মা ও স্নায়ুর জন্য প্রশান্তি, শরীর ও অন্তরের জন্য আরামদায়ক, জীবন ও জীবিকার স্থিরতা এবং রূহ ও অন্তরসমূহের মিলনস্বরূপ। এক কথায় পুরুষ ও নারীর সমানভাবে প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ তা'য়ালা মানব সন্তানের মধ্য হতে মুমিন বান্দাদেরকে বাছাই করে তার বন্ধু বানিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যে তাদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। তারা তার বিধি মোতাবেক কাজ করে থাকেন। যাতে করে তারা জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে পারেন। আর তাদের মধ্য হতেই নবী, রাসূল, ওলী,ও শহীদগণকে চয়ন করে তাদেরকে এই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় নেয়া'মত দান করেন, যা দ্বারা জীবন সুখকর হয়। আর তা হলো আল্লাহর ইবাদত, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলার সুযোগ অর্থাৎ মোনাজাত। এ ছাড়া আরো অনেক নেয়ামত দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেছেন, যেগুলো অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। যেমন– নিরাপত্তা, প্রশান্তি লাভ ও সাফল্য ইত্যাদি। বরং এসবের চেয়ে বড় নেয়া'মত হল– তারা সত্যকে জানতে পেরেছেন যা নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। আর তিনি তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপন ও একনিষ্ঠতার বদৌলতে আখেরাতে গচ্ছিত রেখেছেন জান্নাতের চিরস্থায়ী

সুখ এবং আল্লাহর দয়ার মানানসই মহা সাফল্য। বরং তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে এর চেয়ে আরো অনেক বেশী দেবেন।

নারীর মর্যাদা

নারীরা ইসলামে যে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা জাতির নিকট তা অর্জন করতে পারেনি। কারণ ইসলাম মানুষকে যে মর্যাদা দান করেছে তাতে নারী পুরুষ তথা উভয়েই সমানভাবে শরীক। এই দুনিয়ায় তারা উভয়েই আল্লাহর বিধানের সামনে সমান, তেমনিভাবে আখেরাতেও তারা তাঁর সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الاسراء:٧٠)

অর্থাৎঃ আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৭০)

তিনি আরো বলেনঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (النساء: ٧)

অর্থাৎঃ পুরুষদের জন্যে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যেও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে। (সূরা আন নিসা ৪ ঃ ৭)

তিনি আরো বলেনঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٢٨)

অর্থাৎঃ আর নারীদের উপর তাদের (পুরুষদের) যেরূপ অধিকার আছে, নারীদেরও তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২২৮)

তিনি আরো এরশাদ করেনঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: ٧١)

অর্থাৎঃ আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৭১)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (الاسراء:٢٣ -٢٤)

অর্থাৎঃ তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশাই বার্ধক্যে উপনিত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলোঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ২৩-২৪)

তিনি আরো বলেনঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (آل عمران: ١٩٥)

অর্থাৎঃ সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের পুরুষ বা নারীর মধ্য হতে কোন আমলকারীর আমলকে নষ্ট করব না। (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১৯৫)

তিনি আরো বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل:٩٧)

অর্থাৎঃ মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে, তাকে অবশ্যই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের চেয়ে উত্তম পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৯৭)

আরো এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (النساء:١٢٤)

অর্থাৎঃ আর মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে, ঐ সমস্ত লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা সামান্য পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (সূরা আন নিসা ৪ ঃ ১২৪)

আর নারীরা ইসলামে যে মর্যাদা অর্জন করেছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম, জাতি বা আইনশাস্ত্রে তার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যেমন রোমান সভ্যতায় বলা হয়েছে যে, নারী হলো পুরুষের ক্রীতদাস ও অনুগত। কোন কিছুতেই তার কোন অধিকার নেই। রোমে এক বিশাল সমাবেশে নারীর অধিকার নিয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, নারী এমন এক সৃষ্টি যার কোন নিজস্বতা নেই। আর সে একারণে অন্য মানুষের উত্তরাধীকারিণী হতে পারবে না। সে হলো একটি অপবিত্র জাতি। গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো। সে ছিলো ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য এবং তাকে শয়তানী কাজের অপবিত্র বস্তু বিবেচনা করা হতো। ভারতের প্রাচীন ধর্মগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, নারীর চেয়ে প্লেগ রোগ, মৃত্যু, জাহান্নাম, সাপের বিষ ও আগুন উত্তম। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থিব জীবনে স্ত্রীর অধিকার শেষ হয়ে যেত। নারী যখন তার স্বামীর মৃতদেহ পুড়তে দেখত তখন (বাধ্যতামূলকভাবে) সেই আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করত। কারণ এমনটি না করলে তাকে অভিশাপ ও বিভিন্ন ধরণের মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করতে হতো।

ইয়াহুদী ধর্মের OLD TESTAMENT-এ নারীর বিধান সম্পর্কে যা বর্ণনা এসেছে তা নিম্নরূপঃ আমি মন প্রাণ দিয়ে হেকমত ও আকলকে জানার ও অনুসন্ধানের জন্য এবং অনিষ্টতাকে মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতাকে পাগলামি জানার জন্য প্রদক্ষিন করলাম, ফলে আমি মৃত্যুর মত একটি

বিষয় খুজে পেলাম; তা হচ্ছে: নারী হলো জানালার মতো, তার অন্তর হলো জুতার ফিতার মতো এবং তার হাত দুটি হাতকড়ায় বন্দি। (সাফারুল জামেয়া' আল ইসহাহঃ ৭; ২৫-২৬; আর একথা সবার জানা আছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানেরা OLD TESTAMENT কে পবিত্র মনে করে এবং তাকে বিশ্বাস করে)

এতো হলো প্রাচীনকালের নারীর কথা। পক্ষান্তরে মধ্যযুগীয় ও বর্তমানে নারীর অবস্থা কেমন তা নিম্নের বর্ণিত কিছু ঘটনায় পরিষ্কার হয়ঃ ডেনমার্কের লেখক উয়েথ কোর্ডস্টেন নারীর প্রতি ক্যাথলিক গীর্জার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ ক্যাথলিক মতাদর্শের দৃষ্টি অনুসারে মধ্যযুগে ইউরোপীয় নারীদের মূল্যায়ন ছিল অতি নগণ্য। তারা নারীদেরকে দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টিজীব মনে করতো।

ফ্রান্সে ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি সম্মেলন হয়, সেখানে নারীর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন উঠে– নারী কি মানুষের অন্তর্ভুক্ত, না অন্তর্ভুক্ত নয়? অবশেষে অনেক বিতর্কের পর উপস্থিত সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নারী মানুষের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু পুরুষের সেবার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফ্রান্সের আইন শাস্ত্রের ২১৭ নং ধারাতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ চুক্তি করার সময় স্বশরীরে স্বামীর অংশগ্রহণ অথবা তার লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিবাহিত নারীর তার নিজের সম্পদ দান করা, মালিকানা পরিবর্তন করা, বন্ধক রাখা, কোন কিছুর বিনিময়ে অথবা বিনিময় ছাড়া কোন সম্পদের মালিক হওয়া বৈধ নয়; যদিও তার বিবাহের সময় স্বামী ও স্ত্রীর সম্পত্তি পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকুক না কেন।

আর ইংল্যাণ্ডে অষ্টম হ্যানরী ইংরেজ নারীদের উপর পবিত্র (ধর্মীয়) কিতাব পড়া নিষিদ্ধ করেছিল। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নারীরা ছিল দেশের নাগরিকদের গণনার বাইরে এবং ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নারীদের ব্যক্তিগত কোন অধিকারও ছিল না। (ড. আহমাদ শিবলী রচিত 'সিলসিলাতু মুকারানাতিল আদইয়ানঃ ৩য় খণ্ড, ২১০-২১৩ নং পৃষ্ঠা)

আর আধুনিক যুগে ইউরোপ,আমেরিকা ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোতে নারীদেরকে মনে করা হয়, তাদেরকে যেন ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ সে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ব্যবসায়িক প্রচার অভিযানে

নারীদেরকে উলঙ্গ করে তার উপর পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে। পুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু নিয়ম-নীতির কারণে তার দেহ ও ইজ্জত বৈধ করা হয়েছে, যাতে করে তাদের জন্য সর্বত্র সে বিনোদনের বস্তু হয়। বর্তমানে নারীর মূল্যায়ন ততোদিন পর্যন্ত অটুট থাকে যতোদিন সে নিজ হাতে উপার্জন করতে পারে এবং চিন্তা ও শরীর দিয়ে সমাজে অবদান রাখতে পারে। তারপর যখন সে বৃদ্ধা হয় এবং দান করার সকল উপকরণ হারিয়ে ফেলে তখন সমাজের সকল মানুষ এবং সকল প্রতিষ্ঠান তার থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরপর সে তার বাড়িতে অথবা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে একাকী জীবন যাপন করে। উপরের এগুলোর সাথে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে যা এসেছে তার মাঝে তুলনা করে দেখুন (নারীকে ইসলাম কতবড় মর্যাদা দান করেছে! আল্লাহু আকবার) যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: ٧١)

অর্থাৎঃ আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৭১)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٢٨)

অর্থাৎঃ আর নারীদের উপর তাদের যেরূপ অধিকার আছে, নারীদেরও তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২২৮)

তিনি আরো ঘোষণা করেনঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (الاسراء:٢٣-٢٤)

অর্থাৎঃ তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে;

তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপণীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলোঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ২৩-২৪)

নারীকে আল্লাহ তা'য়ালা এমন সম্মান দান করে সকল মানুষকে একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাকে মা, স্ত্রী, মেয়ে এবং বোন করে সৃষ্টি করেন। যার কারণে তিনি শুধুমাত্র নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বিশেষ কিছু বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা আদম (عليه السلام) এবং তার সহধর্মিণী হাওয়াকে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। তারপর আদম (عليه السلام) সেখানে তাঁর রবের নাফরমানী করে বসলে তিনি তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেন ও তাঁকে হেদায়েত দান করেন এবং তাঁকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। ফলে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার অনেক রহস্য রয়েছে, জ্ঞান যা বুঝতে এবং যবান যা বর্ণনা করতে অক্ষম। এই পরিচ্ছেদে সামান্য কতিপয় রহস্য উপস্থাপন করব। যথাঃ

১ - মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্যে, আর এটাই হচ্ছে তাদেরকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذريات:٥٦)

অর্থাৎঃ আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যে। (সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ ৫৬)

আর সবার জানা রয়েছে যে, সুখ ও চিরস্থায়ী আবাসস্থলে মানুষের নিকট হতে কাংক্ষিত পূর্ণাঙ্গ ইবাদত অর্জিত হবে না। বরং তা অর্জিত হবে দুঃখ কষ্ট এবং বিপদ-আপদের আবাসস্থলে। বস্তুত চিরস্থায়ী আবাসস্থল তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আনন্দ উপভোগের নিবাস, দুঃখ ও কষ্টের নিবাস নয়।

২ - আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের মধ্য হতে এমন কিছু নবী, রাসূল, ওলী ও শহীদ বানাতে চান, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তাই তিনি তাদের মাঝে ও তাদের শত্রুদের মাঝে ছেড়ে দেন এবং শত্রুদের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। ফলে তারা যখন তাঁকে অগ্রাধিকার দেন এবং তাদের জীবন ও যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি ও ভালবাসায় ব্যায় করেন, তখন তারা তাঁর ভালবাসা, সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য অর্জন করেন, যা মূলতঃ এছাড়া অর্জন করা যায় না। সুতরাং রিসালাত, নবুওয়াত এবং শাহাদাতের মর্যাদা আল্লাহর নিকট একটি শ্রেষ্টতম মর্যাদা। আর তিনি যে আদম (عليه السلام) এবং তাঁর সন্তানদেরকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ দেন, এই পদ্ধতি ছাড়া মানুষ ওটা অর্জন করতে পারতো না।

৩ - মহান আল্লাহ হলেন স্পষ্ট মহা সত্য অধিপতি বা সম্রাট, আর অধিপতি বা সম্রাট তিনিই, যিনি আদেশ দেন, নিষেধ করেন, সওয়াব দেন, শাস্তি দেন, অপমানিত করেন, সম্মানিত করেন, মর্যাদা দেন এবং লাঞ্ছিত করেন। সুতরাং মহান অধিপতি আদম (عليه السلام) এবং তাঁর সন্ত ানদেরকে এমন এক আবাসস্থলে অবতরণ করাতে চান, যেখানে তাদের উপর তাঁর হুকুম-আহকাম চলবে। অতঃপর তিনি তাদেরকে এমন এক আবাসস্থলে স্থানান্তরিত করবেন, যেখানে তাদের স্বীয় কর্মের প্রতিদান প্রদান সম্পন্ন হবে।

৪ - আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র যমীন হতে একমুষ্ঠি মাটি নিয়ে আদমকে (عليه السلام) সৃষ্টি করেন। আর যমীনের মধ্যে ভাল ও মন্দ, বিষন্নতা ও কোমলতা রয়েছে। সুতরাং তিনি জানেন যে, আদম সন্তানের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা তাঁর আবাসস্থলের (জান্নাতের) বাসিন্দা হওয়ার উপযুক্ত নয়। অতএব তিনি তাঁকে এমন আবাসস্থলে অবতরণ করান, যেখানে ভাল ও মন্দ উভয়ই বের করান। অতঃপর তাদেরকে দুটি আবাসস্থলে পৃথক

করেন; সুতরাং ভাল লোকদেরকে তিনি তাঁর আবাসস্থল ও নৈকট্যের অধিবাসী করেন। আর খারাপ লোকদেরকে দুঃখ ও কষ্টের নিবাস অর্থাৎ দুষ্টদের আবাসস্থলের অধিবাসী করেন।

৫ - মহান আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। যেমন ক্ষমাশীল, দয়াবান, মার্জনাকারী, ধৈর্যশীল ------ইত্যাদি। এ সকল নামের চিহ্ন বা নিদর্শন প্রকাশ হওয়া একান্ত জরুরী। অতএব আল্লাহর হিকমত চাই যে, আদম (عليه السلام) এবং তাঁর সন্তানরা এমন এক আবাসস্থলে অবতরণ করুক, যেখানে তাদের মাঝে আল্লাহর সুন্দর নামের চিহ্ন বা নিদর্শন প্রকাশ হবে, যেমন যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা তিনি দয়া করবেন, যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা ধৈর্য ধারণ করবেন, সুতরাং ইত্যাদি পন্থায় তাঁর নাম ও গুণাবলীর নিদর্শন প্রকাশ করা।

৬ - আল্লাহ তা'য়ালা আদম (عليه السلام) এবং তাঁর সন্তানদেরকে এমন এক গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেন, যারা ভাল ও মন্দ গ্রহণের উপযুক্ত, প্রবৃত্তি ও ফিতনা এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব কারী। তাই আল্লাহ তাদের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেন এবং ওদুটিকে স্থাপন করেন ওদের চাহিদার কারণে, যাতে করে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করেন। আর তাঁর হিকমত ও দাপটের ক্ষেত্রে স্বীয় বান্দাদের নিকট তাঁর শক্তি ও প্রভাব এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও শাসনের মাঝে তাঁর রহমত, দানশীলতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। অতএব তাঁর হিকমত চায় যে, তিনি যেন আদম (عليه السلام) ও তাঁর সন্তানদেরকে পৃথিবীতে অবতরণ করান, যাতে করে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। আর এসব কারণে এবং মানুষের ওগুলো কবুল করার কারণে তাদের প্রস্তুতির নিদর্শন প্রকাশিত হয়। আর তাদের মর্যাদা এবং অসম্মান এর অনুসারেই হয়।

৭ - গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করাই তো কল্যাণকর বিশ্বাস। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ বা দৃশ্যমান জিনিসের প্রতি বিশ্বাস করা, তা তো প্রত্যেক ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন বিশ্বাস করবে। অতএব তাদেরকে যদি সুখ ও আরামের আবাসস্থলে সৃষ্টি করা হতো, তাহলে তারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মর্যাদা লাভ করতো না, যার পরে আসবে আনন্দ ও সম্মান, যা অর্জিত হবে অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখার কারণে। সুতরাং আল্লাহ

তা'য়ালা তাদেরকে এমন এক আবাসস্থলে অবতরণ করান, যেখানে অদৃশ্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপনের অবকাশ থাকে।

৮ - মহান আল্লাহ এ থেকে চান যে, তিনি তাঁর স্বীয় বান্দাদের যাদেরকে তাঁর পূর্ণ নিয়া'মত দান করেছেন এবং ওগুলো নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তা জানাবেন। যাতে করে তারা সব চেয়ে বড় ভালবাসা ও শোকর আদায়কারী এবং যে নেয়া'মত তাদেরকে দান করেন তার বড় মজা উপভোগকারী হতে পারে। তাই তিনি তাঁর শত্রুদের সাথে কিরূপ আচরণ করেন এবং তাদের জন্যে কী শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা তাদেরকে দেখান এবং নির্দিষ্ট করে তিনি তাদেরকে যে সর্বোচ্চ নেয়া'মত দান করেন তা প্রত্যক্ষ করান। যাতে করে তাদের খুশি বেড়ে যায়, অন্যের ন্যায় সুখ কামনা পূর্ণ হয় এবং আনন্দ বৃহৎ হয়। এটা তাদের প্রতি পূর্ণাঙ্গ নেয়া'মত ও ভালবাসার একটি অংশ। আর এ জন্য একান্ত জরুরী হল– পৃথিবীতে তাদেরকে অবতরণ করা, তাদের পরীক্ষা নেয়া, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাওফীক দেয়া; এটা তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ এবং যাকে ইচ্ছা ব্যর্থ করা; এটা তাঁর হিকমত ও ইনসাফ, আর তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞাত ও প্রজ্ঞাবান।

৯ - আল্লাহ তা'য়ালা চান আদম (عليه السلام) ও তার সন্তানেরা সুন্দরতম অবস্থায় জান্নাতে ফিরে আসুক। তাই তিনি তাদেরকে ওর পূর্বেই দুনিয়ার কষ্ট এবং তার দুঃখ ও বেদনার স্বাদ উপভোগ করান। আর তাদেরকে ঐসব জিনিসের আদেশ দেন যার মাধ্যমে পরকালের আবাসস্থল জান্নাতে প্রবেশ করার পরিমাণ তাদের নিকট বড় হবে, কারণ বিপরীতের সৌন্দর্যতা প্রকাশ পায় বিপরীত দ্বারা। (দেখুনঃ মিফতাহু দারিস্ সা'আদাহ; ১ম খণ্ড, ৬ - ১১ নং পৃষ্ঠা)।

মানুষ সৃষ্টির সূচনা বিশ্লেষণ করার পর ভাল মনে করছি যে, তাদের সঠিক দ্বীনের চাহিদা বিষয়ে আলোচনা করব।

মানুষের দ্বীন বা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ তাদের সার্বিক জীবনের অন্যান্য জরুরী বস্তুর যত চাহিদা অনুভব করে তার চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করবে তাদের জন্য দ্বীন আবশ্যক। কারণ মানুষের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রগুলো জানা অনিবার্য। আর তার চালচলন এমন হওয়া উচিত যা তার মঙ্গল বয়ে আনবে এবং তার অনিষ্টতাকে দূর করবে। আর যা উপকার করে এবং যা ক্ষতি করে ঐ সমস্ত কর্মসমূহের মাঝে শরীয়তই পার্থক্য করে। শরীয়ত হচ্ছে সৃষ্টিজীবের মাঝে আল্লাহর ন্যায়নীতি এবং বান্দাদের মাঝে তাঁর আলোকবর্তীকাস্বরূপ। সুতরাং এমন শরীয়ত ব্যতীত কোন মানুষের জীবন যাপন সম্ভব নয়, যার মাধ্যমে তারা কী করবে এবং কী বর্জন করবে তা পার্থক্য করে। মানুষের যেহেতু ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে, সুতরাং তার জানা আবশ্যক যে; সে যা ইচ্ছা করে তা কি তার জন্য কল্যাণকর না কি ক্ষতিকর? তা তাকে সংশোধন করবে, না নষ্ট করবে? এগুলোর কিছু কিছু মানুষ কখনো কখনো তাদের জন্মগত স্বভাবের মাধ্যমে জানতে পারে। আবার কিছু কিছু মানুষ তাদের জ্ঞান দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের মাধ্যমে জানতে পারে। আবার কিছু কিছু মানুষ রাসূলগণের সংজ্ঞাদান ও তাঁদের আলোচনা এবং তাদের সৎপথ পাওয়ার মাধ্যমে তা জানতে পারে। (দেখুনঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রচিত "আত্তাদমুরিয়্যাহ; ২১৩, ২১৪ নং পৃষ্ঠা এবং মিফতাহু দারিস সাআদাহ; ২য় খণ্ড, ৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

ফলে নাস্তিক্য ও বস্তুবাদ ধর্মগুলো যতই বড় হতে ইচ্ছা করুক ও সজ্জিত হোক এবং মতবাদ ও চিন্তাধারাসমূহের সংখ্যাও যতই বেশী হোক না কেন, তা কখনও ব্যক্তি ও সমাজকে সত্য ধর্ম হতে অমুখাপেক্ষী করতে পারবে না এবং শরীর ও আত্মার চাহিদা পূরণেও সক্ষম নয়। বরং যখনই কোন ব্যক্তি এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখনই সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, এগুলো তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তার পিপাসা মিটাতে পারবে না। আর সঠিক ধর্ম ছাড়া এ থেকে আশ্রয়েরও কোন পথ নেই। ঐতিহাসিক আরনেস্ট রায়নাল বলেনঃ প্রত্যেক বস্তু যা আমরা পছন্দ করি তা বিলুপ্ত হওয়া এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিল্পের ব্যবহারের উপযুক্ততা বিনষ্ট হওয়া সম্ভব, কিন্তু দ্বীন বা ধর্ম বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব। বরং তা ঐ সব বস্তুবাদ ধর্মকে বাতিল করার জন্য স্পষ্ট

প্রমাণ হিসেবে (কিয়ামত পর্যন্ত) টিকে থাকবে, যে ভ্রান্ত ধর্ম পার্থিব জীবনে বিভিন্ন নিকৃষ্ট সঙ্কটের মাঝে মানুষকে বেঁধে রাখতে চায়। (বিস্তারিত দেখুনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দারাজ লিখিত 'আদ্‌দ্বীন' নামক গ্রন্থঃ ৮৭ নং পৃষ্ঠা)

আর ঐতিহাসিক ফরীদ ওয়াজদী বলেনঃ ধার্মিকতার চিন্তাধারা বিলীন হয়ে যাবে, এটা অসম্ভব। কারণ তা মনের আকর্ষণকে বৃদ্ধি করে এবং তার অনুভূতিকে সম্মানিত করে। এমন চমৎকার আকর্ষণ যা মানুষের শিরকে উঁচু করে। বরং এই আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি তার জ্ঞানের দ্বারা সুন্দর ও খারাপকে বুঝতে পারবে ততক্ষণ ধর্ম পালনের অভ্যাসের সাথে মানুষ যুক্ত হবেই। এক্ষেত্রে তার অনুভূতির অগ্রগতি এবং জ্ঞানের বিকাশ অনুপাতে এই অভ্যাস বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। (প্রাগুক্তঃ ৮৮ নং পৃষ্ঠা)

সুতরাং মানুষ যখন তার প্রতিপালক থেকে দূরে সরে যায় তখন সে তার অনুভূতির অগ্রগতি ও জ্ঞানের সুদূর পরিধি অনুযায়ী বুঝতে পারে যে, তার প্রতিপালক সম্পর্কে সে কত বড় অজ্ঞ এবং তার জন্য কী আবশ্যক? এবং সে তার স্বীয় আত্মার অজ্ঞতা সম্পর্কেও বুঝতে পারে এবং কী তার উপকার করে ও কি অপকার করে, কী তাকে সুখী করে ও কী তাকে দুঃখী করে? এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও তার পরিভাষা সম্পর্কে যেমন– জ্যোতির্বিজ্ঞান, অণুবিজ্ঞান, পরমাণু বিজ্ঞান ইত্যাদীর অজ্ঞতার কথাও সে বুঝতে পারে। আর এমতাবস্থায়ই জ্ঞানী ব্যক্তি ধোঁকা ও অহমিকার পর্যায় থেকে বিনয়-নম্রতা ও আত্মসমর্পণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তরালে একজন প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী রয়েছেন, প্রত্যেক পদার্থের একজন মহা শক্তিমান স্রষ্টা আছেন। আর এ বাস্তবতাই সত্য ও ন্যায় অন্বেষণকারীকে গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস আনতে, সত্য দ্বীন তথা ধর্মের আনুগত্য করতে এবং জন্মগত ফিতরাতের ডাকের প্রতি সাড়াদানকে বাধ্যতামূলক করে। আর মানুষ যখন এই বাস্তবতা হতে সরে যায় তখনই তার জন্মগত ফিতরাত উল্টে যায় এবং সে বোবা ও নির্বাক জীব-জন্তুর পর্যায়ে চলে যায়।

এ পর্যায়ে এর পরিসমাপ্তি টানবো একথার মাধ্যমে যে, নিশ্চয়ই সঠিক ধার্মিকতা বা দ্বীনদারি যা শুধুমাত্র আল্লাহর এককত্ব এবং তিনি যে পদ্ধতিতে তাঁর ইবাদত করার বিধান প্রণয়ন করেছেন সে মোতাবেক ইবাদত করার উপর নির্ভর করে, তা জীবনের জন্য এক জরুরী মূল

বিষয়। যাতে করে এর ভিত্তিতে মানুষ তার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য বাস্তবায়ন করতে পারে এবং যাতে ধ্বংস, কষ্ট ও দুঃখ হতে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে। মানুষের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি যেন পরিপূর্ণ হয় তার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরী। ফলে এর দ্বারাই (মানুষের) মন তার তীব্র চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এ ব্যতীত সে তার উচ্চ আকাংক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এটি আত্মার পবিত্রকরণ ও অনুভূতি শক্তির সংশোধনের জন্য এক আবশ্যকীয় মূল বস্তু। কারণ দ্বীনের মাঝে উচ্চ আবেগ বা সহানুভূতির ক্ষেত্র ও পরিধি এত অধিক হারে দেখতে পাবেন যে, তার উৎস নিঃশেষ হবে না, যাতে করে আপনি তার শেষ সীমা জানতে পারবেন। এটি ইচ্ছা বা চাহিদা শক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য এক প্রয়োজনীয় মূল উপাদান। যেহেতু তা তাকে বিভিন্ন মহত্তর কারণ ও চালিকাশক্তি দ্বারা সহায়তা করে এবং হতাশা ও নৈরাশ্যের কারণে তাকে প্রতিরোধের সব চেয়ে বড় মাধ্যম দিয়ে রক্ষা করে। এর পরেও কেউ যদি বলেঃ মানুষ স্বভাবতই প্রকৃতিবাদী ও সভ্য, তাহলে আমরাও বলব যেঃ মানুষ জন্মগতভাবেই ধার্মিক বা দ্বীনদার। (প্রাগুক্তঃ পৃষ্ঠা; ৮৪ ও ৯৮)

কারণ মানুষের মাঝে দু'টি শক্তি রয়েছে। যথা– চিন্তাধারার জ্ঞানসংক্রান্ত শক্তি এবং ইচ্ছা বা অভিলাশের জ্ঞানসংক্রান্ত শক্তি। আর মানুষের পূর্ণ সফলতা ও স্বার্থকতা উপরোক্ত দুই জ্ঞান ও ইচ্ছাসংক্রান্ত শক্তির পরিপূর্ণতার উপরই নির্ভরশীল। আর নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত জ্ঞানসংক্রান্ত শক্তির পূর্ণাঙ্গতাও বাস্তবায়ন হবে না, যথা ঃ

১। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা এক আল্লাহ সম্পর্কে জানা, যিনি মানুষকে অস্তিত্ব ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে অসংখ্য নেয়া'মত দান করেছেন।

২। আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জানা। আর তাঁর জন্য কী করা অপরিহার্য এবং তাঁর বান্দাদের উপর এ সমস্ত নামের প্রভাব সম্পর্কে জানা।

৩। এমন পথ সম্পর্কে জানা, যে পথ তাকে তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে।

৪। ঐ সমস্ত বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ-আপদ সম্পর্কে জানা, যা মানুষের মাঝে এবং এই পথকে জানার মাঝে বাধা এবং যা তাকে মহান সুখ-সাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে দেয়ার মাঝে বাধা দেয় সে সম্পর্কে জানা।

৫। আপনার নিজ সত্ত্বা সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা এবং তার জন্য কী প্রয়োজন? কী তার উপকার করে? কী তাকে অপকার করে? এবং কোন্ বস্তু তাকে সুন্দর বৈশিষ্ট্য বা দোষ-ত্রুটির গুণে গুণান্বিত করে সে সম্পর্কে জানা।

সুতরাং এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জানার মাধ্যমেই মানুষ তার জ্ঞানবিষয়ক শক্তিকে পরিপূর্ণ করতে পারে। আর মানুষের উপর আল্লাহর হকগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তা নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতার সাথে যথাযথভাবে তা পালন না করা ব্যতীত জ্ঞান ও ইচ্ছাবিষয়ক শক্তির পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে না। আর তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই দুই শক্তিকে পরিপূর্ণ করার কোন পথও নেই। ফলে মহান আল্লাহ তাকে ঐ সিরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচলিত করতে অস্থির হয়ে পড়েন, যে সঠিক পথের হেদায়েত তিনি তাঁর ওলি- আউলিয়াদেরকে দেন। (বিস্তারিত দেখুনঃ আল-ফাওয়াইদ; ১৮ এবং ১৯ নং পৃষ্ঠা)।

আমরা যখন জানতে পারলাম যে, সঠিক দ্বীন বা ধর্মই হলো বিচ্ছিন্ন আত্মার শক্তি অর্জনের একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য তাহলে আরো জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই দ্বীন সমাজ রক্ষাকারী বর্মও বটে। কারণ মানব জীবন তার অন্যান্য নাগরিকের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর এমন একটি নিয়ম-পদ্ধতি ছাড়া এই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও সম্পূর্ণ হবে না, যা তাদের সম্পর্ককে বিন্যস্ত করবে, তাদের কাজকর্ম বা দায়িত্বকে নির্ধারণ করবে এবং তাদের হকসমূহের জিম্মাদার হবে। এই নিয়ম-পদ্ধতির জন্য এমন এক শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর বাদশার প্রয়োজন, যিনি আত্মাকে তাঁর আইন ভঙ্গ করতে বাধা দেন, তাঁর আইনের হেফাজত করতে উৎসাহ প্রদান করেন, অন্তরের মাঝে তাঁর সম্মান ও ভয় জাগ্রত করেন এবং তাঁর পবিত্রতাকে নষ্ট করতে বারণ করেন। সুতরাং কে এই ক্ষমতাধর ও মহা শক্তিশালী বাদশা? এর উত্তরে আমি বলবঃ নিয়ম-পদ্ধতির মর্যাদার হেফাজত, সমাজকে ধরে রাখা ও তার নিয়মের

স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা এবং শান্তির কারণ সমবেত ও তাতে আস্থা লাভ ইত্যাদীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর বুকে ধার্মিকতার শক্তির সমকক্ষ অথবা তার কাছাকাছি আর কোন শক্তি নেই।

এর মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা হচ্ছে; মানুষ সমস্ত সৃষ্টিজীবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ তার সকল ঐচ্ছিক চাল-চলন ও কার্যকলাপকে পরিচালনা করে এমন এক বস্তু, যার উপর কোন কর্ণ ও চক্ষুর প্রভাব নেই। বরং তা হলো ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস, যা আত্মাকে সংশোধন এবং দেহকে পবিত্র করে। সুতরাং মানুষ সর্বদাই সঠিক অথবা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং যদি তার আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হয়, তাহলে তার সব কিছুই সঠিক হবে। আর যদি তা বাতিল ও ভ্রান্ত হয়, তাহলে সব কিছুই বাতিল হয়ে যাবে। ঈমান এবং আকীদা-বিশ্বাস এ দু'টি মানুষের ব্যক্তি স্বত্তার নিয়ন্ত্রক বা পর্যবেক্ষক। এ দু'টি আবার যে ব্যাপকতার সাথে মানুষের মাঝে লক্ষ্য করা যায় তা দু'প্রকারেরঃ

১। মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের মূল্যবোধের প্রতি ঈমান এবং এ ধরণের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা ব্যক্তির উঁচু মানসিকতা তার প্রয়োজনীয় বস্তুর বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করে। এমনকি যদিও তাকে এ সমস্ত বাহ্যিক দায়ভার ও বস্তুগত বিষয়াদি হতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রতি এই ঈমান রাখা যে, তিনি সকল গোপন বিষয়ের নিয়ন্ত্রক বা পর্যবেক্ষক, ফলে তিনি সকল গোপনীয়তার বিষয়ে পূর্ণজ্ঞাত। শরীয়ত আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই মদদপুষ্ট এবং আত্মিক অনুভূতি তাঁরই লজ্জায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। হয় তাঁর প্রতি ভালবাসার কারণে অথবা তাঁর ভয়ে অথবা একসাথে উভয়টির কারণে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমানের এই প্রকারটিই ক্ষমতার দিক দিয়ে মানবাত্মার উপর অধিক শক্তিশালী, প্রবৃত্তির তাড়না ও আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তনের জন্য প্রতিরোধের দিক দিয়ে তীব্রতর এবং বিশেষ ও সর্বসাধারণ তথা সকল মানুষের অন্তরে বাস্ত বায়নের দিক দিয়ে দ্রুততম। এ কারণেই ন্যায়বিচার ও ইনসাফের মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের মাঝে পারস্পরিক আচরণ সম্পাদন করার জন্য দ্বীন বা ধর্মই হলো সর্বোত্তম গ্যারান্টি। এ জন্যই দ্বীন সামাজিকভাবে

প্রয়োজন। সুতরাং মানুষের শরীরের যে স্থানে অন্তর অবস্থান করে সেই স্থানে যদি দ্বীন অবস্থান করে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সাধারণতই দ্বীন বা ধর্মের অবস্থান যখন এমন পর্যায়ে, অথচ বর্তমান এই পৃথিবীতে বহুসংখ্যক দ্বীন ও জাতি দৃশ্যমান এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে দেখবেন, তাদের কাছে যে ধর্ম আছে তা নিয়ে তারা আনন্দিত এবং তাকে তারা আঁকড়ে ধরে আছে। সুতরাং সঠিক ধর্ম কোন্‌টি, যে ধর্ম মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন বাস্তবায়ন করবে? আর সত্য দ্বীনের মূলনীতিই বা কি?

সত্য দ্বীনের (ধর্মের) মূলনীতি

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বিশ্বাস করে যে, একমাত্র তার ধর্মই সত্য এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা মনে করে যে, তাদের ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিকতর সঠিক। আপনি যখন বিকৃত অথবা মানব রচিত ধর্মের অনুসারীদের নিকট তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে দলীল জানতে চাইবেন, তখন তারা যুক্তি পেশ করে যে, তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে এ পদ্ধতির উপর পেয়েছে, সুতরাং তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। অতঃপর তারা বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ও সংবাদ বর্ণনা করে যার সূত্র বিশুদ্ধ নয় এবং তার মূল অংশ (আসল ঘটনা) দোষ ত্রুটি ও নিন্দা থেকে মুক্ত নয়। আর তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এমন সব কিতাবের উপর নির্ভর করে, যেগুলো কে বলেছে, কে লেখেছে, সর্বপ্রথম তা কোন্ ভাষাই লেখা হয়েছিল, কোন্ দেশে তা পাওয়া গেছিল, তা জানা যায় না। বরং ওগুলো মিশ্রিত ও বিজড়িত কিছু গল্প-কাহিনী যা একত্রিত করা হয়, তারপর ওর সম্মান করা হয়, অতঃপর জ্ঞানসম্মত তদন্ত ছাড়াই বিনা সূত্র ও অবিন্যস্ত মূল অংশ বংশ প্রজন্ম পরস্পর ওগুলির উত্তরাধিকারী হয়।

এ সমস্ত অজ্ঞাত কিতাবাদী, গল্প কাহিনী এবং অন্ধ অনুকরণ দ্বীন ও আক্বীদার ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে যথাযথ নয়। অতএব এ সব বিকৃত ও মানব রচিত ধর্মগুলো কি সঠিক, না বাতিল? সবগুলোই সত্যের প্রতিষ্ঠিত

উপর হবে এটা অসম্ভব। কারণ সত্য একটাই, একাধিক নয়। আর এ সব প্রত্যেক বিকৃত ও মানব রচিত ধর্মগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে হবে এবং সব গুলোই সত্য এটাও অসম্ভব। আর ধর্মগুলো যখন একাধিক এবং সত্য একটিই, সুতরাং সত্য কোন্‌টি? অতএব অবশ্যই এমন কতগুলো মূলনীতি রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা বাতিল দ্বীন হতে সত্য দ্বীনকে জানতে পারবো। সুতরাং আমরা যদি কোন দ্বীনে এই মূলনীতির প্রয়োগ দেখতে পাই, তাহলে জানবো যে, ওটাই সত্য। পক্ষান্তরে যদি এই মূলনীতিগুলো অথবা তার একটি কোন দ্বীনে ত্রুটিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হয়, তাহলে জানবো যে, ওটা বাতিল।

যে মূলনীতির দ্বারা সত্য দ্বীন ও বাতিল দ্বীনের মাঝে আমরা পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবো তা নিম্নরূপঃ

১ - সেই দ্বীন হবে আল্লাহর পক্ষ হতে, যা তিনি একজন ফেরেশতার (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) মাধ্যমে তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেন, যাতে করে তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট তা প্রচার করেন, কারণ সত্য দ্বীন তো আল্লাহরই দ্বীন। তিনি ক্বিয়ামতের দিন মানুষ ও জ্বীনের বিচার করবেন ও হিসাব নেবেন ঐ দ্বীনের ভিত্তিতে যা তিনি তাদের নিকট অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً (النساء:١٦٣)

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি, যেরূপ আমি নূহ (عليه السلام) ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করেছিলাম এবং ইবরাহীম (عليه السلام), ইসমাঈল (عليه السلام), ইসহাক (عليه السلام), ইয়াকুব (عليه السلام) ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা (عليه السلام), আইয়ুব (عليه السلام), ইউনুস (عليه السلام), হারূন (عليه السلام), ও সুলাইমান (عليه السلام)-এর প্রতি ওহী করেছিলাম এবং আমি দাঊদ (عليه السلام)-কে যাবুর প্রদান করেছিলাম। (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৬৪)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبياء:٢٥)

অর্থাৎঃ আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করি তাকে এই ওহী করি যে, আমি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৫)

এর উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি যদি কোন দ্বীন পালন করে এবং তা আল্লাহ ব্যতীত নিজের দিকে সম্বন্ধ করে, তাহলে নিশ্চিতরূপে সেই দ্বীন বাতিল।

২ - সেই দ্বীন শুধুমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করার দিকে এবং শিরক ও শিরককের দিকে ধাবিত করে এমন যাবতীয় মাধ্যমকে হারাম সাব্যস্ত করার আহ্বান করে। কারণ এক আল্লাহরই ইবাদত তথা তাওহীদের দিকে আহ্বান করা নবী ও রাসূলগণের দা'ওয়াতের মূল বুনিয়াদ। প্রত্যেক নবী তাঁর আপন জাতিকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ [الأعراف : ٧٣]

অর্থাৎঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৭৩)

এর উপর ভিত্তি করে যদি কোন দ্বীন শিরককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং আল্লাহর সাথে অন্য কোন নবী, ফেরেশতা অথবা ওলীকে অংশীদার করে, তাহলে সেই দ্বীন বাতিল, যদিও সেই দ্বীনের অনুসারীরা কোন এক নবীর সম্পৃক্ততা দাবী করে।

৩ - সেই দ্বীন যেন ঐ মূলনীতির সাথে ঐকমত্য হয় যার দিকে সমস্ত রাসূল আহ্বান করেন; যথাঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, তাঁর পথে মানুষকে আহ্বান, আর শিরক, হারামসহ পিতা-মাতার অবাধ্যতা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে হারাম সাব্যস্ত ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبياء:٢٥)

অর্থাৎঃ আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করি তাকে এই ওহী করি যে, আমি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বূদ নাই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৫)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام:١٥١)

অর্থাৎঃ (হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি লোকদেরকে বলুনঃ তোমরা এসো! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি কী কী হারাম করেছেন, তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাবো, আর তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দেব, আর অশ্লীলতার নিকটবর্তীও হবে না, তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ (অর্থাৎ যে কারণে হত্যা করা শরীয়তে অনুমোদিত তা) ছাড়া তাকে হত্যা করো না, এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তা অনুধাবন করতে পার। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৫১)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (الزخرف:٤٥)

অর্থাৎঃ আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ স্থির করেছি, যাদের ইবাদত করা যায়। (সূরা যুখরুফ ৪৩ ঃ ৪৫)

৪ - সেই দ্বীনে যেন পরস্পরবিরোধী নিয়ম এবং একটা আরেকটার বিপরীত না হয়। সুতরাং তা এমন কোন বিষয়ের আদেশ করবে না, যা পরে তা ভঙ্গ করে দেয়। অনুরূপ কোন জিনিসকে হারাম করবে না, যা পরে বিনা কারণে তার অনুরূপ জিনিসকে বৈধ করে এবং কোন বস্তুকে এক শ্রেণীর জন্য হালাল করে আবার তা অন্য শ্রেণীর জন্য হারাম করে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (النساء:٨٢)

অর্থাৎঃ তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো, তাহলে তারা ওর মধ্যে অনেক মতানৈক্য পেতো। (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৮২)।

৫ - সেই দ্বীন যেন এমন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যা আদেশ, নিষেধ, হুশিয়ারী, আখলাক ইত্যাদি বিধান করার মাধ্যমে মানুষের ধর্ম, মান-সম্মান, সম্পদ, জীবন ও বংশ এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে হিফাজত করে।

৬ - সেই দ্বীন হবে সকল সৃষ্টিজীবের জন্য তাদের নিজেদের এবং তাদের পরস্পরের প্রতি জুলুম করা হতে রহমতস্বরূপ। চাই এ জুলুম হক্ব নষ্ট করার মাধ্যমে হোক অথবা কল্যাণের সাথে স্বেচ্ছাচারের মাধ্যমে হোক অথবা বড়দের কর্তৃক ছোটদেরকে বিপদগামী করার মাধ্যমে হোক। আল্লাহ তা'য়ালা রহমত সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, যা তিনি মূসা (عليه السلام)-এর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ঃ

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (لأعراف:١٥٤)

অর্থাৎঃ মূসা (عليه السلام)-এর রাগ যখন প্রশমিত হল, তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্যে তাতে যা লিখিত ছিল; তা হল হেদায়েত ও রহমত। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৫৪)

মহান আল্লাহ ঈসা (عليه السلام)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেনঃ

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً (مريم: ٢١)

অর্থাৎঃ এবং তাঁকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করবো, যেন তিনি মানুষের জন্যে এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহের প্রতীক হন। (সূরা মারইয়াম ১৯ ঃ ২১)

মহিমান্বিত আল্লাহ সালেহ (عليه السلام) সম্পর্কে এরশাদ করেনঃ

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً (هود: ٢٨)

অর্থাৎঃ তিনি বললেন: হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বলতো আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর সন্নিধান হতে রহমত দান করেন। (সূরা হুদ ১১ ঃ ২৮)

মহান আল্লাহ মহা গ্রন্থ আল কুরআন সম্পর্কে বলেনঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الاسراء: من الآية ٨٢)

অর্থাৎঃ আর আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্যে আরোগ্য ও রহমত। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৮২)

৭ - সেই দ্বীন যেন এমন সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যা আল্লাহর বিধানের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর আল্লাহ মানুষের নিকট কী চান সে দিকে তাকে পরিচালিত করে এবং তাকে সংবাদ দেন যে সে কোথা থেকে এসেছে ও কোথায় তার গন্তব্য? আল্লাহ তা'য়ালা তাওরাত সম্পর্কে বলেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ [المائدة : ٤٤]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত এবং আলো। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৪)

আর তিনি ইঞ্জিল সম্পর্কে এরশাদ করেনঃ

وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ [المائدة : ٤٦]

অর্থাৎঃ আর আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত এবং আলো। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৬)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্পর্কে বলেনঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ [التوبة : ٣٣]

অর্থাৎঃ তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৩৩)

আর সত্য দ্বীন তো ওটাই, যা আল্লাহর বিধানের দিকে পথ প্রদর্শন করাকে লালন করে এবং জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করে। যেহেতু তা মনের প্রত্যেক কুমন্ত্রণাকে দূর করে এবং প্রত্যেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় ও প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করে।

৮ - সেই দ্বীন যেন উত্তম চরিত্র এবং সৎকর্মের দিকে আহ্বান করে, যেমনঃ সত্যবাদিতা, ইনসাফ, আমানত, লজ্জা, পবিত্রতা, উদারতা ইত্যাদি। আর খারাপ কাজ হতে নিষেধ করে, যেমনঃ পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মানুষ হত্যা, অশ্লীলতা নিষিদ্ধ, মিথ্যা, জুলুম, অবিচার, কৃপণতা ও পাপাচার।

৯ - যে ব্যক্তি সেই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনে সে যেন তার কল্যাণ নিশ্চিত করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

طه – مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى [طه : ١، ٢]

অর্থাৎঃ ত্বা-হা-। (হে মুহাম্মাদ ﷺ!) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। (সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ১-২)

আর তা যেন সঠিক ফিৎরাত বা প্রকৃতির সাথে একমত হয়;

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا [الروم : ٣٠]

অর্থাৎঃ আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম ৩০ ঃ ৩০)

আর তা যেন সঠিক জ্ঞানের সাথেও ঐকমত্য হয়, কারণ সঠিক দ্বীন তো হল আল্লাহর শরীয়ত। আর সঠিক জ্ঞানও তো আল্লাহর দেয়া। আর আল্লাহর শরীয়ত এবং তাঁর সৃষ্টি পরস্পরবিরোধী হবে; এটা অসম্ভব।

১০ - সেই দ্বীন যেন সত্যের পথ দেখায় এবং বাতিল হতে সতর্ক করে। হেদায়েতের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং ভ্রষ্টতা হতে দূরে সরিয়ে দেয়। আর মানুষকে এমন এক সিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সোজা সরল পথের দিকে আহ্বান করে, যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নেই। আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সব জ্বিনদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, যখন তাদের একদল কুরআন পড়া শুনে পরস্পর বলেছিলঃ

يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (الاحقاف: ٣٠)

অর্থাৎঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শ্রবণ করেছি যা মূসা (عليه السلام)-এর পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে এবং সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (সূরা আহক্বাফ ৪৬ ঃ ৩০)

সুতরাং যার মধ্যে কষ্ট রয়েছে তার দিকে দ্বীন তাদেরকে আহ্বান করে না। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

طه – مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ: لِتَشْقَى (طه ١, ٢)

অর্থাৎঃ ত্বা-হা -। (হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। (সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ১-২)

যার মধ্যে তাদের ধ্বংস রয়েছে তার নির্দেশও তাদেরকে করে না।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (النساء:٢٩)

অর্থাৎঃ আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ২৯)

লিঙ্গ, বর্ণ ও গোত্রের কারণে তাদের অনুসারীদের মাঝে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات:١٣)

অর্থাৎঃ হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশী পরহেযগার। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজরাত ৪৯ ঃ ১৩)

অতএব সত্য দ্বীনের মধ্যে মর্যাদার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হল; আল্লাহ ভীতি অর্জন।

যে নীতিমালার মাধ্যমে সত্য দ্বীন এবং বাতিল দ্বীনের মধ্যে পার্থক্য করা যায় তা উপস্থাপন এবং এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণস্বরূপ যা উল্লেখ করেছি তা এটাই প্রমাণ করে যে, এই সকল নীতিমালা আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত সকল সত্যবাদী রাসূলগণের জন্য আম বা সার্বজনীন। এরপর দ্বীন বা ধর্মের প্রকারভেদ উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে করছি।

দ্বীন বা ধর্মের প্রকারঃ

মানব সমাজ ধর্মের দিক দিয়ে দু ভাগে বিভক্ত: এক প্রকার যাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব রয়েছে; যেমন: ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান। কিন্তু ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তাদের কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুযায়ী আমল না করায়, আল্লাহকে ছেড়ে মানুষকে তাদের প্রভু বানিয়ে নেওয়া এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া, ইত্যাদি কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের নবীগণের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন তা বিলুপ্ত করে ফেলেন। তখন পাদ্রী বা পুরোহিতরা তাদের জন্য কিতাব লেখে আর ধারণা করে যে, ওগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে নয়। বরং ওগুলো বাতিল পন্থীদের ধারণা এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা মাত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কিতাব মহা গ্রন্থ "আল কুরআন" হচ্ছে, সময়ের দিক দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ কিতাব এবং হেফাজতের দিক দিয়ে অধিকতর মজবুত। কারণ এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, এর দায়িত্ব কোন মানুষের উপর ছেড়ে দেননি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر:٩)

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণকারী। (সূরা হিজর ১৫ ঃ ৯)

এ কুরআন বহু মানুষের বক্ষে (মুখস্ত) এবং কিতাবের আকৃতিতে (লিখিত) সংরক্ষিত রয়েছে। কারণ এটি এমন এক সর্বশেষ কিতাব, যার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা এই মানব জাতির জন্য হেদায়েত নিশ্চিত করেছেন। আর এটিকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ স্থির করেছেন এবং একে স্থায়ী করেছেন। আর প্রত্যেক যুগে যে ব্যক্তিই এর সীমারেখা ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, এর শরীয়ত মোতাবেক আমল করবে এবং এর প্রতি বিশ্বাস রাখবে তার জন্য তা সহজ করেছেন। এই মহা গ্রন্থ আল কুরআন সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা পরবর্তী অনুচ্ছেদেই আসছে।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলঃ যাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কোন কিতাব নেই। যদিও তাদের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এমন কিতাব রয়েছে, যাকে তাদের ধর্মগুরুর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, যেমনঃ হিন্দু, অগ্নি পূজক, বৌদ্ধ, কাম্ফুশী এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের আরব। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব এমন কিছু জ্ঞান ও কর্ম রয়েছে যার ভিত্তিতে তারা তাদের পার্থিব জগতের কল্যাণ সম্পাদন করে। এটি হচ্ছে ঐ সাধারণ হেদায়েত বা পথ দেখানোর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক মানুষকে দেন, বরং প্রত্যেক প্রাণীকে দেন। যেমন তিনি প্রাণীকে পথ দেখান এমন জিনিস অর্জন করার যা খেলে ও পান করলে তার উপকার হবে এবং এমন বস্তু দূর করার যা তার ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর মধ্যে কোন বস্তুর আসক্তি আবার কোন বস্তুর প্রতি অনিহা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى - وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (الأعلى :١-٣)

অর্থাৎঃ আপনি আপনার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুণ। যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পরিপূর্ণভাবে ঠিক করেছেন। আর যিনি নিরূপণ করেছেন, তারপর হেদায়েত দিয়েছেন। (সূরা আ'লা ৮৭ ঃ ১-৩)

মূসা (عليه السلام) ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طـه:٥٠)

অর্থাৎঃ আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথার্থ আকৃতি দান করছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ৫০)

আর ইবরাহীম (عليه السلام) বলেনঃ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (الشعراء:٧٨)

অর্থাৎঃ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা শুআ'রা ২৬ ঃ ৭৮, দেখুনঃ আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ; ৪র্থ খণ্ড, ৯৭ নং পৃষ্ঠা)।

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যারা সামান্যতম চিন্তা ভাবনা করেন, তারা জ্ঞাত আছেন যে, কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যারা ধর্মাবলম্বী নয় তাদের চেয়ে ধর্মাবলম্বীরা শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অমুসলিমদের কাছে যে সব কল্যাণকর বস্তু পাওয়া যায়, তার চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ পাওয়া যায় মুসলমানদের কাছে। এর কারণ হল– জ্ঞান ও কর্ম দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ যা বুদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত, যেমন: গণীতশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, কারিগরি বা শিল্পকলা ইত্যাদি। এ সব বিষয় ধর্মাবলম্বীদের নিকট আছে, যেমন অন্যদের নিকটেও রয়েছে, বরং এ ব্যাপারে বিধর্মীরাই শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে যা শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না, যেমন: আল্লাহ সম্পর্কে ও দ্বীনের জ্ঞান। এগুলো ধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্দিষ্ট। আর এগুলো ঐ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে ব্যাপারে বিবেক প্রসূত যুক্তিগত দলীল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর রাসূলগণ মানবজাতিকে যে যুক্তি প্রমাণের পথ প্রদর্শন করেছেন তা হল– শারয়ী যুক্তি (শরীয়তের জ্ঞান ভিত্তিক)।

দ্বিতীয় প্রকারঃ যা রাসূলদের (ﷺ) সংবাদ দেয়া ছাড়া জানা যায় না। এগুলো ঐ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা যুক্তির দ্বারা অর্জন করার কোন উপায়ই নেই। যথা: আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে খবর এবং তাঁর নাম ও তাঁর গুণাবলীসমূহ, যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করবে তার জন্য জান্নাতে কী নেয়া'মত আছে, আর যে তার নাফরমানী করবে তার জন্য কী শাস্তি রয়েছে, তাঁর শরীয়তের বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে তাদের

নবীদের সংবাদ ইত্যাদি। (দেখুনঃ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রণীতঃ মাজমূ' ফাতাওয়া; ৪র্থ খণ্ড, ২১০, ২১১ নং পৃষ্ঠা)

বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা

বড় বড় ধর্মসমূহ ও এ সকল ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ ও শরীয়তগুলো রহস্যময় ও স্ববিরোধীতা মানুষের খেল-তামাশার শিকার এবং গুরুতর দুর্ঘটনার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অবশেষে তার মূলরূপ ও বাস্তবতা হারিয়ে যায়। ফলে ঐ সমস্ত ধর্মের নবীগণ এবং তাদের অনুসারীগণ পুনরায় প্রেরীত হলে তারা অবশ্যই ঐ সব কিতাব ও শরীয়তগুলোকে অস্বীকার করতেন। যেমন ইয়াহুদী ধর্মে বর্তমানে বহু ধরণের ধর্মীয় প্রথা ও আদর্শ বিদ্যমান, যার মধ্যে না আছে কোন আত্মা, না আছে কোন প্রাণ, বরং দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এগুলো বংশগত, কোন জাতিগত ও নির্দিষ্ট বর্ণগত ধর্মীয় ব্যবস্থা। যা মূলত জগতের জন্য কোন কল্যাণকর মিশন বহন করে না, আর না মানবতার জন্য রয়েছে তাতে দয়া-কৃপা। (বিস্তারিত দেখুন স্যামুয়েল বিন ইয়াহয়া আল মাগরিবী নামক এক ইয়াহুদী যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হন তার লিখিত "ইফহামুল ইয়াহুদ" গ্রন্থ)

এ ধর্মগুলো তাদের মৌলিক সঠিক আকীদা-বিশ্বাসচুত হয়ে ভ্রষ্ট হয়, অথচ ধর্ম ও জাতিসমূহের মাঝে সেগুলো ছিল মৌলিকতার মর্যাদার রহস্য। আর তা হলো; আকীদাতুত তাওহীদ (এককত্বের পূত-পবিত্র বিশ্বাস) যার অসিয়ত-উপদেশ করেন ইবরাহীম (عليه السلام) তাঁর ছেলে ইয়াকুব (عليه السلام) কে। ইয়াহুদীরা তাদের পার্শ্ববর্তী জাতীর অথবা যারা তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল তাদের অনেক বাতিল বা ভ্রান্ত বিশ্বাস লাভ করে। যাদের অধিকাংশ রীতি ও বিশ্বাসই ছিল জাহেলী পৌত্তলিক। এ বাস্তবতা স্বীকার করেন ন্যায়পরায়ণ ইয়াহুদী ঐতিহাসিকগণ। যেমন "দায়েরাতুল মাআরিফ আল ইয়াহুদিয়্যাহ" নামক গ্রন্থে এসেছে, যার অর্থ হল– মূর্তিপূজার প্রতি নবীগণের রাগ ও ক্রোধই প্রমাণ করে যে, মূর্তিপূজা ও বহু উপাস্যের উপাসনা ইসরাঈলীদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল এবং তারা বিভিন্ন প্রকার শিরকী ও কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছিল। তালমুদও নির্দিষ্ট করে ইয়াহুদীদের মূর্তিপূজার প্রতি আকর্ষণের সাক্ষ্য দেয়। (Jewish encycl pace vol.xll (p.7). 568-69)

আর তালমুদ (তালমূদ শব্দের অর্থ; ইয়াহুদীদের ধর্ম ও আদব শিক্ষার কিতাব। যা বিভিন্ন সময়ে ইয়াহুদী পণ্ডিতদের "মুশান্ন তথা শরীয়ত" কিতাবের ব্যাখ্যা ও টীকার সমষ্টি)। বাইবেল কিতাবকে ইয়াহুদীরা এত বেশী পবিত্র মনে করে যে, কখনও কখনও তাকে তাওরাতের উপরে প্রধান্য দেয়। কিতাবটি খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়াহুদীদের মাঝে প্রচলিত ছিল। কিতাবটি এমন সব অদ্ভত ও আশ্চর্য বিষয় দিয়ে ভরা, যেমন জ্ঞানের স্বল্পতা ও নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহর উপর দুঃসাহস দেখানো এবং বাস্তবতা, দ্বীন ও বোধশক্তিকে নিয়ে খেল-তামাশা ইত্যাদি, যা ঐ সময়ে ইয়াহুদী সমাজ জ্ঞানের অবক্ষয় ও দ্বীনের ব্যাপারে বাতিল গ্রহণের প্রবণতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা প্রমাণ করে। (বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন; ড. রুহলাঞ্জ রচিত "আল ইয়াহুদী আলা হাসাবিত তালমূদ" এবং ড. ইউসুফ হান্না নাসরুল্লাহ কর্তৃক ফ্রান্স থেকে আরবী ভাষায় ঐ গ্রন্থটির অনুবাদ গ্রন্থ "আল কানযুল মারসূদ ফী কাওয়াইদিত তালমূদ)

পক্ষান্তরে খ্রীস্টান ধর্ম (বিস্তারিত দেখুনঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত "আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ" এবং রহমাতুল্লাহ বিন খলীল হিন্দী রচিত "ইজহারুল হক্ব" ও আব্দুল্লাহ তরজুমান যিনি খ্রীস্টান ছিলেন, পরে মুসলমান হন তার লিখিত "তুহফাতুল আরীব ফিররদ্দি আলা ইবাদিস সলীব" গ্রন্থসমূহ) যা প্রথম যুগ থেকেই সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা এবং রুমানিয় মূর্তিপুজক খ্রীস্টানদের ফিতনার শিকার হয়। (দেখুনঃ দারাবুর নামে প্রসিদ্ধ এক ইউরোপীয় লেখকের "আসসেরা' বাইনাদ দ্বীনে ওয়াল ইলমে" ৪০ও ৪১ নং পৃষ্ঠা)

আর এসব কিছু এমন এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়– যার ফলে ঈসা (عليه السلام)-এর মহান শিক্ষা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ওগুলোর তীব্র টানের অন্তরালে এককত্বের আলো ও আল্লাহর যাবতীয় ইবাদতের একনিষ্ঠতা আত্মগোপন করে।

এক খ্রীস্টান লেখক উল্লেখ করেন যে, তাদের সমাজে তৃত্ববাদের বিশ্বাস প্রবেশ করে চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে। তিনি বলেনঃ এককত্বের বিশ্বাস যা তিন ব্যক্তিত্যের সমন্বয়ে গঠিত এবং তার মতবাদ বিশ্বের খ্রীস্টান সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশে। (আরব খ্রীস্টানদের মতে এই তিন ব্যক্তি হল– পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম। অনুবাদক)

আর তা খ্রীষ্টীয় সমাজের সর্বত্র প্রথাগত নির্ভরযোগ্য আকীদা বা বিশ্বাস হিসেবে চলতে থাকে। আর ত্রিত্ববাদের আক্বীদার ক্রমবিকাশ ও তার গোপন রহস্য উন্মোচন হয় খ্রীষ্টীয় উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে। (দায়েরাতুল মাআ'রিফ আল ক্যাথুলিকিয়্যাহ আল জাদীদাহ; মাক্বালুত তাছলীছ আল মুক্বাদ্দাসঃ ১৪ নং খণ্ড; ২৯৫ নং পৃষ্ঠা)

"তারীখুল মাসীহিয়্যাহ ফী জওইল ইলমিল মুআ'সির" বা বর্তমান জ্ঞানের আলোকে খ্রীস্টান ধর্মের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে সমসাময়িক এক খ্রীস্টান তাদের সমাজে ঐতিহাসিক বিভিন্ন রূপরেখায় পৌত্তলিকতা আবির্ভূত হওয়া এবং অন্ধঅনুকরণ, বিস্ময় ও মূর্খ নীতির মাধ্যমে অন্যান্য জাতি ও শিরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের অনেক নিদর্শন, প্রথা, উৎসব এবং মূর্তিপুজায় তাদের মিশে যাওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেনঃ "পৌত্তলিকতা শেষ হয়েছে, কিন্তু তা পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয়নি, বরং তা তাদের অন্তরে গ্রোথিত হয়ে গেছে এবং সেখানে খ্রীস্টান ধর্মের নামে ও তার আড়ালে সব কিছু অব্যাহত আছে। ফলে (পৌত্তলিক থেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে) যারা তাদের (খ্রিস্টানদের) উপাস্য ও গুরুদের পরিত্যাগ করেছিল, তখন তারা তাদের যেকোনো একজন শহীদকে গ্রহণ করে তার সাথে উপাস্যের গুণগুলো লাগিয়ে দেয়। (অর্থাৎ সেই শহীদকেই তাদের উপাস্য বানিয়ে নেয়। তারপর তাদের মূর্তি তৈরি করে। এভাবেই এই শিরক ও মূর্তি পূজার প্রচলন ঐ সমস্ত শহীদদের দিকে পরিবর্তিত হয়। আর এই শতাব্দী শেষ হতে না হতেই তাদের মাঝে শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের উপাসনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুন আক্বীদা (বিশ্বাস) রচিত হয়; আর তা হচ্ছে ওলীগণ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে (অর্থাৎ তারা আল্লাহর মত, তাদের মাঝে আল্লাহর গুণ বিদ্যমান নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক, এটা স্পষ্ট শিরকী আক্বীদা (অনুবাদক) এবং ঐসমস্ত ওলী তথা আল্লাহর সৎ ব্যক্তি ও সাধকগণ আল্লাহ ও মানুষের মাঝে এক মাধ্যমে পরিণত হয়। মূর্তিপুজা উৎসবের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম করা হয়। এমনকি চারশ শতাব্দীতে 'ঈদুশ শামসিল ক্বাদীম' নামের এক উৎসব 'ঈদু মীলাদিল মাসীহ' বা ঈসা মাসীহর জন্ম উৎসবে পরিবর্তিত হয়। (Rev.jamecs hovstion Baxter is history of christionity in the light of. P. 407, 1929. modern knowledge Gtasgow)

আর অগ্নি-উপাসকগণ বহু পূর্ব যুগ থেকেই তাদের প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে সব চেয়ে বড় হল আগুন। সম্প্রতি তারা এর উপাসনায় জমে বসে; এজন্যে তারা প্রতিমূর্তি ও মন্দির তৈরী করে। ফলে দেশের সর্বত্র আগুনের ঘর-বাড়ী ছড়িয়ে পড়ে এবং অগ্নি পুজা ও সূর্য পুজা ছাড়া সমস্ত আক্বীদা ও ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর তাদের কাছে ধর্ম বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনের সমষ্টিতে পরিণত হয়, যা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তারা তা পালন করে। (দেখুনঃ কুবনাহাজন আদ ডেনমার্ক কলেজের প্রাচ্য ভাষাবিদ ও ইরানের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আর্থার কৃষ্টান সিং রচিত "ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যীন" এবং শাহীন মাকারিউস আল মাজূসী লিখিত "ইরানের ইতিহাস" গ্রন্থদ্বয়)

"ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যীন" এর লেখক প্রফেসর আর্থার কৃষ্টান সিং তাদের ধর্ম প্রধানদের স্তর এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করে বলেনঃ ঐ সমস্ত কর্মকর্তাদের উপরে দিনে চারবার সূর্যের উপাসনা করা আবশ্যক ছিল এবং তার সাথে চন্দ্র, আগুন ও পানির উপাসনাও যুক্ত করা হত। আর তারা আদিষ্ট ছিল আগুন যেন নিভে না যায়, পানি ও আগুন যেন একসাথে স্পর্শ না করে এবং খনিজপদার্থ যেন শব্দ না করে, কারণ খনিজপদার্থসমূহ তাদের নিকট পবিত্র ছিল। (ইরান ফী আহদিস সাসানিয়্যীনঃ ১৫৫ নং পৃষ্ঠা)

তারা সকল যুগেই দ্বৈতনীতির অনুগত ছিল এবং এটা তাদের প্রতীকে পরিণত হয়। তারা দুই উপাস্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে; এদের একজন নূর বা কল্যাণের দেবতা, যাকে তারা 'আহোর মাযদা বা ইয়াযদান' নামে অভিহিত করে। আর দ্বিতীয়জন অন্ধকার বা অকল্যাণের দেবতা, তার নাম আহরমান। এদের উভয় দেবতার মাঝে সংঘাত ও লড়াই সর্বদায় অব্যাহত আছে। (প্রাগুক্তঃ আদদ্বীনুয যারতুশতী দ্বীয়ানাতুল হুকূমাহ অধ্যায়; ১৮৩-২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

আর বৌদ্ধ ধর্ম হল পৌত্তলিকতার ধর্ম। এই ধর্মটি ভারত ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। এ ধর্মের অনুসারীরা যেখানেই যায় এবং যেখানেই অবস্থান করে সেখানেই তারা তাদের মূর্তি নিয়ে যায়, মন্দির তৈরী করে এবং গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতি দাঁড় করায়। (দেখুনঃ হায়দারাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আইশুরা তূবার 'আল হিন্দুল ক্বাদীমাহ বা প্রাচীন ভারত' এবং সাবেক ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহার লাল নেহেরু লিখিত 'ইকতেশাফুল হিন্দ বা The discovery of India; 201- 202 নং পৃষ্ঠা)

আর হিন্দু ধর্ম বহু উপাস্য ও দেবতার ধর্ম হিসেবে খ্যাত। খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পৌত্তলিকতা বিভিন্ন আকৃতিতে পৌঁছেছিল। ফলে এই শতাব্দীতে তাদের দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটিতে পৌঁছে। (দেখুনঃ আর দত্তের লিখিত 'আল হিন্দুল ক্বাদীমাহ (বা প্রাচীন ভারত) গ্রন্থ; ৩য় খণ্ড, ২৭৬ নং পৃষ্ঠা এবং ও.এস. এস.আই মালের লিখিত 'আল হান্দাকিয়্যাতুস সায়িদাহ; ৬-৭ নং পৃষ্ঠা)

পৃথিবীর সকল সুন্দর বস্তু, সকল ভয়ঙ্কর বস্তু এবং সকল কল্যাণকর বস্তুই তাদের উপাস্য বা দেবতায় পরিণত হয়, যাদের তারা উপাসনা করত। আর এ যুগে প্রতিমা নির্মাণও বেড়ে যায় এবং নির্মাণ শিল্পীরা এতে খুব সুন্দর শিল্পদক্ষতা প্রদর্শন করে।

সি,ওয়াই বেদ হিন্দু তার 'মধ্য ভারতের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে সম্রাট হারিশের শাসন কাল ৬০৬-৬৪৮ খ্রীস্টাব্দ সাল অর্থাৎ যে যুগটি আরবে ইসলামের আবির্ভাবের নিকটবর্তী ঐ যুগে মানুষের ধর্মীয় অবস্থান কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেঃ হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম দুটিই পৌত্তলিকতার ধর্ম, যারা উভয়েই সমান ছিল। বরং সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মই পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মকে ছাড়িয়ে যায়। এ ধর্মের সূচনা হয় উপাস্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কিন্তু তারা পর্যায়ক্রমে গৌতম বুদ্ধকেই বড় উপাস্য বানিয়ে নেয়। অত:পর তার সাথে আরো অনেক উপাস্যকে যুক্ত করে যেমন; "bodhisattvas"। ভারতে পৌত্তলিকতা বিভিন্ন আকৃতিতে পৌঁছে ছিল। এমনকি প্রাচ্যের কতক ভাষাতে বুদ্ধ Buddha শব্দটি তার একার্থবোধক শব্দ মূর্তি হিসেবে ব্যবহার হয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পৌত্তলিকতা বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত তথা সমগ্র পৃথিবী পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত। বরং খ্রীস্টান, বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন সেমেটিক ধর্মগুলো মূর্তিকে সম্মান প্রদর্শন ও পবিত্র করার ক্ষেত্রে যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে। তারা যেন সবাই প্রতিযোগীতার ঘোড়ার মত একই ময়দানে দৌড়াচ্ছে। (c.v. vidya: history of mediaval hindu vol; 1 1921)

অন্য আরেক হিন্দু তার লিখিত 'আল হিন্দুকিয়্যাতুস সায়িদাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করে যে, মূর্তি তৈরীর কাজ এখানেই শেষ হত না বরং বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে এই "উপাস্য পল্লীতে" অনেক বেশী সংখ্যায় ছোট ছোট

উপাস্য অন্তর্ভুক্তকরণ চলতে থাকে। এমনকি তাদের অনেকে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যক মূর্তি একত্রিত করে। (দেখুনঃ আবুল হাসান নদভীর আস সীরাতুন নববীয়্যাহ; ১৯-২৮ নং পৃষ্ঠা)

এ তো হল ধর্মের অবস্থা। পক্ষান্তরে যে সমস্ত সভ্য দেশগুলোতে মহা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল; যেখানে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল। যা শিল্প, সভ্যতা ও সাহিত্যের ঠিকানা ছিল। সে সমস্ত দেশে ধর্মসমূহ বিকৃত হয়ে পড়েছিল। দেশ তার আভিজাত্য, শক্তি ও সংস্কারকগণকে হারিয়েছিল। শিক্ষকগণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। নাস্তিকতা সেখানে জাহির হয়েছিল। ফেতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছিল। মানুষ তার নিজের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যার কারণে আত্মহত্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পারিবারিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সামাজিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। মানসিক ডাক্তারদের রোগী পরিদর্শন কষ্টকর হয়ে গেছিল। যাদুকর ও ভেলকিবাজদের বাজার কায়েম হয়েছিল। সেখানে মানুষকে প্রত্যেক উপভোগ ও প্রমোদের জন্য পরীক্ষা করা হত এবং সে খুশী মনে প্রত্যেক নতুন জিনিসের অনুসরণ করত। এই আশায় যে, তার আত্মাকে পরিতৃপ্ত ও সুখী করবে এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত আনন্দ প্রমোদ, ধর্ম এবং মতবাদ কোনই সফলতা আনতে পারেনি। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত না হবে এবং তিনি তাঁর নিজের জন্য যে পদ্ধতি পছন্দ করেছেন ও তাঁর রসূলগণকে যার আদেশ করেছিলেন সে মোতাবেক তাঁর ইবাদত না করবে ততক্ষণ এই মানসিক দুঃখ-কষ্ট এবং আত্মিক শান্তি চলতেই থাকবে। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক হতে বিমূখ হয় এবং অন্যের নিকট হেদায়েত চায়, আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে তাদের অবস্থা উল্লেখ করে এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه : ١٢٤]

অর্থাৎঃ যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়। (সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ১২৪)

পক্ষান্তরে এই পার্থিব জীবনে মুমিনদের নিরাপত্তা ও সফলতার সংবাদ জানিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ [الأنعام : ٨٢]

অর্থাৎঃ প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের স্বীয় ঈমানকে যুলুমের সাথে (শিরকের সাথে) সংমিশ্রিত করেনি, আর তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (সূরা আনআ'ম ৬ ঃ ৮২)

তিনি আরো এরশাদ করেনঃ

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ [هود : ١٠٨]

অর্থাৎঃ আর যারা সৌভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে স্থায়ী হবে যে পর্যন্ত আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য রকম ইচ্ছে করেন। এ হল এক অব্যাহত পুরস্কার। (সূরা হুদ ১১ ঃ ১০৮)

ইসলাম ছাড়া বাকী অন্যান্য ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে যদি সত্য দ্বীনের মূলনীতিগুলো প্রয়োগ করি, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, ঐ সমস্ত উপাদানের অধিকাংশই সেগুলোতে অনুপস্থিত, যেমন এ সম্পর্কে উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে তা স্পষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত ধর্মগুলো সব চেয়ে বড় যে বিষয়টি বাদ দেয়– তা হল তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্ব। এ ধর্মগুলোর অনুসারীরা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যদেরকে অংশীদার স্থির করে। তেমনিভাবে এই বিকৃত ধর্মগুলো মানুষের সামনে এমন শরীয়ত পেশ করেনি যা সকল যুগে ও সকল স্থানের জন্য উপযুক্ত। যা মানুষের ধর্ম, সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ও রক্তসমূহের হেফাজত করবে। আর তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশিত শরীয়তের দিকেও পরিচালিত করে না এবং তার অনুসারীদেকে প্রশান্তি ও সুখও প্রদান করে না। কারণ এগুলোর মাঝে অনেক বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আসছে, যাতে পরিষ্কার হবে; ইসলাম আল্লাহর মনোনীত

সত্য ও কিয়ামত অবধি স্থায়ী দ্বীন বা ধর্ম যার প্রতি তিনি নিজে সন্তুষ্ট এবং মানুষের জন্যেও তার প্রতি সন্তুষ্ট। এই পরিচ্ছেদ শেষে ভাল মনে করছি– এখন আমি নবুওয়াতের হক্বীকত, তার নিদর্শনাবলী, মানুষের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা, রাসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা এবং পরিসমাপ্তকারী ও চিরস্থায়ী রেসালতের হাক্বীকত আলোচনা করব।

নবুওয়াতের তাৎপর্য

ইহজীবনে মানুষের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার প্রতিপালকের পরিচয় জানা। যিনি তাকে কোন অস্তিত্ব ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং অগণিত নেয়া'মত দান করেছেন।

আর মহান আল্লাহর সৃষ্টিকূল সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হলো একমাত্র তাঁর ইবাদত বাস্তবায়ন করা। কিন্তু মানুষ তার প্রতিপালককে যথাযথভাবে কিভাবে চিনবে, তাঁর কী কী অধিকার ও নির্দেশাবলী রয়েছে? এবং সে কিভাবে তার মনিবের ইবাদত করবে? মানুষ তো খুব সহজেই এটা খুঁজে পায়, বিপদে কে তার সাহায্য করবে? এবং কে তার সহযোগিতামূলক কাজ করবে, যেমন; রোগের চিকিৎসা করা, ঔষধ সরবরাহ, বাসস্থান নির্মাণে সহযোগিতা এবং এ ধরণের অন্যান্য কাজ?। কিন্তু সমগ্র মানুষের মাঝে সে এমন কাউকে পাবে না, যে তার প্রভুর পরিচয় সম্পর্কে তাকে বিবেক দ্বারা অবহিত করবে এবং কিভাবে সে তার প্রভুর ইবাদত করবে তা বর্ণনা করবে, কারণ বিবেকের পক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার কথা জানা সম্ভব নয়। আর একজন মানুষ তার মত আরেকজন মানুষের ইচ্ছার কথা তাকে অবহিত করার পূর্বে সে তা জানবে এটা হতে মানুষের বিবেক অনেক দুর্বল। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের কথা জানা কিভাবে সম্ভব। কারণ এই গুরু দায়িত্ব নবী ও রসূলগণের উপর সীমাবদ্ধ, যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে রেসালাত পৌঁছানোর জন্য মনোনীত করেছেন। আর পরবর্তীতে যে সব আলেম ও নবীগণের ওয়ারিস আসবে, তাদের দায়িত্ব হলো– তারা তাদের পদ্ধতি মেনে চলবে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের পক্ষ হতে রেসালাত পৌঁছে দেবে। কারণ মহান

আল্লাহর পক্ষ হতে শরীয়তের বিধি-বিধান গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা এর সামর্থ রাখে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (الشورى:٥١)

অর্থাৎঃ মানুষের জন্য অসম্ভব যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা শূরা ৪২ ঃ ৫১)

সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বিধি-বিধান বান্দাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই একজন মাধ্যম ও দূত প্রয়োজন। আর এ সকল দূতগণই হলেন নবী ও রাসূল। ফেরেশতা নবীর নিকট আল্লাহর রেসালাত নিয়ে আসে, তারপর নবী তা মানুষের নিকট পৌঁছান। কিন্তু ফেরেশতা কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের নিকট রেসালাত নিয়ে আগমন করেন না। কারণ স্বভাবগত দিক থেকে ফেরেশতাদের জগত মানুষের জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (الحج:٧٥)

অর্থাৎঃ আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে দূত (বাণীবাহক)মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৭৫)

রাসূলকে তার স্বজাতির নিকট পাঠানোই যুক্তিসঙ্গত, যাতে করে তারা তাঁর নিকট হতে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং তারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার সম্বোধন ও বক্তব্য বুঝতে পারে। যদি ফেরেশতাদের মধ্য হতে কাউকে রসূল করে পাঠানো হতো তাহলে তারা তার মুখামুখি অবস্থান করতে পারতো না এবং কোন কিছু গ্রহণ করতেও পারতো না। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ৩য় খণ্ড, ৬৪ নং পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ) (الأنعام:٨ – ٩)

অর্থাৎঃ আর তারা বলে যে, তাদের কাছে কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হয় না? আমি যদি প্রকৃতই কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম তবে যাবতীয় বিষয়েই চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে কিছু মাত্র অবকাশ দেয়া হতো না। আর যদি আমি ফেরেশতাই অবতীর্ণ করতাম তবে তাকে মানুষরূপেই করতাম। আর আমার এ কাজ দ্বারা তাদেরকে আমি সেই বিভ্রান্তিতেই ফেলে দিতাম, যে আপত্তি তারা এখন করছে। (সূরা আনআ'ম ৬ ঃ ৮-৯)

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً - وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً) (الفرقان:٢٠ -٢١)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ)! তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা আহার করতেন ও হাটে-বাজারে যেতেন। আমি তোমাদের মধ্যে পরস্পরকে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন। যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলেঃ আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করে এবং তারা গুরুতররূপে সীমালঙ্ঘন করেছে। (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ২০-২১)

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ (النحل: من الآية ٤٣)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ) তোমার পূর্বে আমি সবাইকে ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৪৩)

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراهيم:٤)

অর্থাৎঃ আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে করে তারা তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে। (সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৪)

এই সকল নবী ও রাসূল পূর্ণ বিবেক বুদ্ধি, সুস্থ ফিতরাত, কথা ও কাজে সত্যবাদীতা, অর্পিত দায়িত্ব প্রচারের ক্ষেত্রে আমানতদারীতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী এবং মানব চরিত্রকে কলংকিত করে এমন সকল পাপ থেকে মুক্ত, দৃষ্টিকটু এবং সুস্থ রুচিবোধ যাকে অপছন্দ করে এমন কিছু থেকে শারীরিক সুস্থতার গুণে গুণান্বিত। (লাওয়ামিউল আনওয়ারুল বাহিয়্যাহঃ ২য় খণ্ড, ২৬৫ নং পৃষ্ঠা এবং আহমাদ শিলবী রচিত কিতাব "আল্ ইসলাম" ঃ ১১৪ নং পৃষ্ঠা)

মানসিক ও চারিত্রিক দিক থেকে মহান আল্লাহ তাদেরকে পূত ও পবিত্র রেখেছেন। ফলে তারা সব চেয়ে চরিত্রবান মানুষ। মনের দিক থেকে সব চেয়ে পবিত্র এবং প্রভাব, প্রতিপত্তি ও শক্তির দিক থেকে অতি সম্মানিত। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও সুন্দর সুন্দর স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যেমন তাদের মধ্যে একত্রিত করেছেন ধৈর্য্য, জ্ঞান, উদারতা, বদান্যতা, দানশীলতা, সাহসীকতা এবং ন্যায়পরায়ণতা। এমনকি তারা তাদের সম্প্রদায়ের মাঝে এধরণের সুন্দর স্বভাবে শ্রেষ্ঠ। যেমন কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সালেহ (عليه السلام)-এর জাতি সম্পর্কে সংবাদ দেন– তারা তাকে বলেছিলঃ

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا (هود: من الآية٦٢)

অর্থাৎঃ তারা বললঃ হে সালেহ তুমি তো ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসা ছিলে, তুমি কি আমদেরকে ঐ বস্তুর উপাসনা করতে নিষেধ করছো; যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষেরা করে এসেছে। (সূরা হুদ ১১ ঃ ৬২)

শোয়াইব (عليه السلام)-এর সম্প্রদায় তাকে বলেছিল ঃ

أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (هود: من الآية٨٧)

অর্থাৎঃ তোমার নামায কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষ করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে যে, আমরা নিজেদের সম্পদে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ ধৈর্যশীল ও নেককার। (সূরা হুদ ১১ ঃ ৮৭)

শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর কওমে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে "আল আমীন" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রব্ব তাঁকে বিশেষ বিশেষণে ভুষিত করে এরশাদ করেনঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم:٤)

অর্থাৎঃ হে নবী (ﷺ) নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন। (সূরা কলম ৬৮ ঃ ৪)

সুতরাং তাঁরা সৃষ্টিকূলের সেরা। তিনি তাদেরকে রেসালাত বহন করার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ আমানত প্রচারের জন্য মনোনীত করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الأنعام:١٢٤)

অর্থাৎঃ নবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই অবগত। (সূরা আনআ'ম ৬ ঃ ১২৪)

তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (آل عمران:٣٣)

অর্থাৎঃ নিশ্চয়াই আল্লাহ আদম (عليه السلام)-কে ও নূহ (عليه السلام)কে এবং ইবরাহীম (عليه السلام)-এর সন্তানগণকে ও ইমরান (عليه السلام)-এর সন্তানগণকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৩৩)

আর আল্লাহ তা'য়ালার এ সকল নবী ও রাসূলগণের উন্নতমানের গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তারা উচ্চ গুণে পরিচিতি লাভ করা সত্ত্বেও তারা ছিলেন মানুষ। তারা ঐ সব মানবীয় গুণে গুণান্বিত হন যেমন অন্য সকল

মানুষও সে সব গুণের অধিকারী হয়। যেমন তারা ক্ষুধার্ত হন, অসুস্থ হন, ঘুমান, খাবার খান, বিবাহ-শাদী করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (الزمر:٣٠)

অর্থাৎঃ হে নবী তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ৩০)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً (الرعد:٣٨)

অর্থাৎঃ তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ৩৮)

বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হতেন অথবা তাদেরকে হত্যা করা হতো অথবা নিজ বাসস্থান হতে বিতাড়িত হতেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (الأنفال:٣٠)

অর্থাৎঃ আর যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে, তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহও পরিকল্পনা করতে থাকেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩০)

তথাপিও দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণতি, সাহায্য ও সহযোগিতা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (المجادلة:٢١)

অর্থাৎঃ আল্লাহ সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিশালী পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ ৫৮ ঃ ২১)

নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী

সর্বোত্তম জ্ঞান শিক্ষা এবং সর্বোত্তম কাজ পালন করার মাধ্যম যেহেতু নবুওয়াত, তাই আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ রহমত যে, তিনি এ সমস্ত নবীদেরকে এমন কিছু আলামত প্রদান করেছেন যা তাদের সত্যতা প্রমাণ করে এবং মানুষেরা ওর মাধ্যমে তাঁদের যুক্তি প্রদর্শন করে ও তাঁদেরকে চিনতে পারে। যদিও যারাই নবুওয়াত দাবী করে তাদের ক্ষেত্রে এমন সব লক্ষণ ও অবস্থাদি প্রকাশ পায়, যা তার সততা প্রমাণ করে, যদি সে সত্যবাদী হয়। আর তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। এই আলামতগুলো অনেক, তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেশ করছিঃ

১- রাসূল, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং আর আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুর ইবাদত পরিত্যাগ করার আহ্বান করেন। কারণ একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

২- তিনি মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে, তাঁকে বিশ্বাস করতে এবং তাঁর রিসালাতের প্রতি আমল করার আহ্বান করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে এ কথা বলার আদেশ করেন যে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً (الأعراف: ١٥٨)

অর্থাৎঃ হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরীত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৫৮)

৩- আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে নবুওয়াতের বিভিন্ন প্রকার দলীল প্রমাণাদী দ্বারা সাহায্য করেন। আর নবী যে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদী নিয়ে আসেন তাঁকে তাঁর স্বজাতিরা ফিরিয়ে দিতে অথবা তার অনুরূপ আনতে সক্ষম হয় না। যেমন মূসা (عليه السلام)-এর নিদর্শন; যখন তার লাঠি সাপে পরিণত হয়, ঈসা (عليه السلام)-এর নিদর্শন; যখন তিনি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আল্লাহর হুকুমে সুস্থ করেন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিদর্শন; যথা মহাগ্রন্থ আল কুরআন, এমন নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও যে: তিনি পড়তে ও লেখতে জানেন না।

ইত্যাদি নবীদের অনেক নিদর্শনাবলী। আর নবী ও রাসূলদের নিয়ে আসা এ নিদর্শনসমূহ এমন স্পষ্ট ও মহা সত্য যে, শত্রুরা তাকে প্রতিহত

বা অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তারা জানে যে, নবীরা যা নিয়ে আগমন করেন তা এমন স্পষ্ট মহা সত্য যাকে প্রতিহত করা যায় না। এ সকল নিদর্শন যা আল্লাহ নবীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, পূর্ণাঙ্গ বিষয়, মহৎ গুণ এবং উদার স্বভাব ও চরিত্রের অন্তর্গত। এসব নিদর্শন হল তাঁদের জন্য তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁরা যে আহ্বান করেন তার প্রকাশ।

৪- মৌলিকগতভাবে তাঁর আহ্বান আর সকল নবী ও রাসূল যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন তার মূলনীতির সাথে মিল হবে।

৫- তাঁর নিজের ইবাদত করা অথবা ইবাদতের কোন কিছু তাঁর দিকে সম্পর্কিত অথবা তাঁর সম্প্রদায়ের সম্মান করা ইত্যাদির আহ্বান তিনি করেন না। বরং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আদেশ করেন, তিনি যেন মানুষকে এ কথা বলেন ঃ

قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ (الأنعام: ٥٠)

অর্থাৎঃ (হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি বলে দিন! আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের কোন জ্ঞানও রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যা কিছু ওহীরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ৫০)

৬ - তিনি তাঁর দা'ওয়াতের বিপরীতে মানুষের কাছে পার্থিব দুনিয়ার কোন সম্পদ তলব করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী যেমন; নূহ (عليه السلام), হুদ (عليه السلام), সলেহ (عليه السلام), লূত (عليه السلام), শোআইব (عليه السلام) আলাইহিমুস সালাম গণের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে, তাঁরা তাদের স্বজাতিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِين (الشعراء:١٠٩)

অর্থাৎঃ আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকটই আছে। (সূরা শুআ'রা ঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪ ও ১৮০ নং আয়াত)

আর মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর জাতিকে বলেন ঃ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (ص:٨٦)

অর্থাৎঃ (হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি বলে দিন! আমি এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না; এবং আমি বানোয়াটদের (ভানকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা সোয়াদ ৩৮ ঃ ৮৬)

আর এই সমস্ত নবী ও রাসূল যাদের সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য এবং নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী আপনাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করলাম, তাঁদের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

(النحل: ٣٦)

অর্থাৎঃ আর নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতের পূজা বর্জন করবে। (সূরা নাহাল ১৬ ঃ ৩৬)

মানুষ তাঁদের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং ইতিহাস তাঁদের সংবাদ লিপিবদ্ধ করে আনন্দিত হয়েছে। তাঁদের দ্বীনের বিধানাবলী বর্ণনা হয় ধারাবাহিকভাবে। আর এটাই হচ্ছে হক্ব ও ইনসাফ। এমনিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে যে সাহায্য করেন এবং তাঁদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন তাও বর্ণনা হয় ধারাবাহিকভাবে। যেমন নূহ (عليه السلام)-এর জাতির তুফান, ফেরআউনের সাগরে ডুবে যাওয়া, লূত (عليه السلام)-এর জাতির আযাব, মুহাম্মাদ (عليه السلام)-এর তাঁর শত্রুদের উপর বিজয় লাভ এবং তাঁর দ্বীনের প্রসার ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলো জানবে সে নিশ্চিতরূপে অবগত হবে যে, তাঁরা মঙ্গল ও হেদায়েত নিয়ে এসেছিলেন এবং মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করতে যা তাদেরকে উপকার করবে ও তাদেরকে সতর্ক করতে যা তাদের ক্ষতি করবে সে জন্যই তাঁরা আগমন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন নূহ (عليه السلام) এবং সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)।

রাসূলগণের প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষিতা

নবীগণ হলেন আল্লাহর প্রেরিত দূত। তাঁরা তাঁর বাণীসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। যারা তাঁর আদেশসমূহ পালন করে তাদেরকে আল্লাহ যে সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুসংবাদ দেন এবং যারা তাঁর নিষেধাবলী অমান্য করে তাঁরা তাদেরকে চিরস্থায়ী আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেন, আর তাঁরা তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতির সংবাদ এবং তাদের পালনকর্তার হুকুম অমান্য করার কারণে দুনিয়াতে তাদের উপর যে আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তা বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রদত্ত এ সমস্ত আদেশ ও নিষেধ জানার ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান স্বনির্ভরতা অর্জন করবে তা অসম্ভব। যার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মর্যাদা ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধসমূহ জারি করেছেন। কারণ মানুষ তাদের প্রবৃত্তি ও মনের চাহিদা অনুযায়ী চলতে পছন্দ করে। ফলে অবৈধ ও নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ে, পরস্পরের উপর চড়াও হয় এবং তাদের অধিকার হরণ করে।

সুতরাং এটা একটি পরিপূর্ণ হিকমত যে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে নবী ও রাসূল প্রেরণ করবেন; যারা তাদেরকে আল্লাহর আদেশসমূহ বর্ণনা করবেন, তাঁরা পাপের মাঝে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক করবেন, তাদের প্রতি ওয়াজ-নসীহত করবেন এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ তাদেরকে জানাবেন। কারণ বিস্ময়কর সংবাদ যদি কানে আঘাত করে এবং অদ্ভুত অর্থ যদি মনকে সজাগ করে, তাহলে বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করে, ফলে তার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে এবং বোধশক্তিকে শুদ্ধ করে। মানুষের মধ্যে অধিক শ্রবণকারী, অধিক অন্তঃকরণশীল হয়, আর অধিক অন্তঃকরণশীল অধিক চিন্তাশীল হয়, আর অধিক চিন্তাশীল অধিক জ্ঞানী, আর যে অধিক জ্ঞানী সে অধিক আমলকারী হয়। সুতরাং রাসূল প্রেরণ করা হতে ন্যায়সঙ্গত এবং সত্য বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বিকল্প আর কিছু পাওয়া যায় না। (আলী বিন মুহাম্মাদ আল মাওয়ারদী লিখিত " আ'লামুন নবুওয়াহ ঃ ৩৩)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ[৩] মানুষের ইহকাল ও পরকালে শান্তির জন্য রিসালাত অপরিহার্য।

---

৩. তিনি হলেন আহমাদ বিন আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম, ইবনে তাইমিয়া নামে সুপ্রসিদ্ধ, তিনি ৬৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭২৮ হিজরীতে

রেসালাতের অনুসরণ ছাড়া যেমন পরকালীন কল্যাণ নেই, অনুরূপ তার অনুসরণ ছাড়া পার্থিব জীবনেও কোন মঙ্গল নেই। অতএব মানুষ শরীয়ত অনুসরণ করতে বাধ্য। কারণ মানুষ সাধারণত দু'টি গতিবিধি বা নড়া-চড়ার মাঝে রয়েছে যথা–

এক ঃ যা তার কল্যাণ ও সফলতা বয়ে আনে।

দুই ঃ যা তার নিকট থেকে ক্ষতিকর বস্তুকে দূরভীত করে।

আর শরীয়ত এমন এক আলোকবর্তিকা, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং যা ক্ষতিকর, উভয় দিক স্পষ্ট করে দেয়। আর তা আল্লাহর যমীনে তাঁর জ্যোতি, বান্দাদের মাঝে তাঁর ন্যায়বিচার এবং এমন এক দূর্গ, যে তাতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে। শরীয়ত দ্বারা কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বস্তুর মাঝে ইন্দ্রিয়গতভাবে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এটা জীব-জন্তুর জন্য প্রযোজ্য। কারণ গাধা বা উটও গম আর মাটির মাঝে পার্থক্য করতে পারে। বরং রিসালত দ্বারা উদ্দেশ্য হল; এমন কাজ কর্ম যা তার কর্তার ইহকাল ও পরকালে ক্ষতি করবে এবং এমন কাজ যা তার কল্যাণ করবে, তার মাঝে পার্থক্য করে দেয়া। উভয়কালীন কল্যাণকর বিষয়গুলোর মধ্যে যেমনঃ বিশ্বাস স্থাপন, এককত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, সদ্ব্যবহার, দয়া, আমানতদারীতা, ক্ষমা, বীরত্ব, জ্ঞানার্জন, ধৈর্যধারণ, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান, অধিকার রক্ষা, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্য আমল করা, তাঁর প্রতি ভরসা করা ও একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া, তার তাক্বদীরসমূহের অবস্থানের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, তাঁর হুকুম মান্য করা, তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান এবং এ ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক ঐ কাজ যা দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার জন্য উপকারী। আর এর বিপরীতে যা দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার জন্য দুঃখ ও অনিষ্টকর। আর যদি রেসালাত না হতো তাহলে জ্ঞান বা বুদ্ধি পার্থিব জীবনে কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না। সুতরাং বান্দার প্রতি আল্লাহর সব চেয়ে বড়

মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ইসলামী বড় বড় আলেমদের অন্যতম। তাঁর অনেক মূল্যবান লিখিত কিতাব রয়েছে।

নেয়ামত ও দয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে সঠিক পথ বর্ণনা করেছেন। আর এটা যদি না হতো তবে তারা পশুর পর্যায়ে পৌঁছে যেত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিপতিত হত। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর রেসালাতকে গ্রহণ করল এবং তার উপর অবিচল থাকল সেই সৃষ্টির সেরা। পক্ষান্তরে যে তা পরিত্যাগ করল ও তা হতে বের হয়ে গেল, সে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম এবং সে কুকুর ও শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট আর প্রত্যেক হীন ও নীচ থেকেও অতি নীচ। পৃথিবীবাসীর জন্য তাদের মাঝে বিদ্যমান রেসালাতের অনুসরণ ছাড়া তাদের অস্তিত্বও টিকে থাকবে না। যখনই পৃথিবী হতে রাসূলগণের পদাঙ্কানুসরণ ও তাদের হেদায়েতের চিহ্ন মুছে যাবে তখনই আল্লাহ তা'য়ালা এর উপর নীচ সব ধ্বংস করে দেবেন এবং কিয়ামত ঘটাবেন। পৃথিবীবাসী রাসূলদের প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী, ততটুকু চন্দ্র, সূর্য, বাতাস ও বৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। বরং মানুষ তার জীবনের প্রতি, চোখ তার জ্যোতির প্রতি এবং দেহ খাদ্য ও পানির প্রতিও ততটুকু মুখাপেক্ষি নয়। বরং এগুলোর চেয়ে আরো বেশী মুখাপেক্ষি এবং সে যা অনুমান করে ও তার মনে মনে ভাবে তার চাইতেও বেশী প্রয়োজন। রাসূরগণই আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাঁর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে একমাত্র মাধ্যম। তারাই আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূতস্বরূপ। তাদের সর্বশেষ, সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ﷺ) যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং পথ অবলম্বনকারী ও সকল সৃষ্টিজীবের উপর প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। বান্দাদের উপর তার আনুগত্য করা, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর সম্মান করা, তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর যথাযথ হক আদায় করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস আনা ও তাঁর আনুগত্য করার ব্যাপারে সমস্ত নবী ও রাসূলগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর তিনি তাদরকে আদেশ করেছেন তারাও যেন তাদের মুমিন অনুসারীদের নিকট হতে তার অঙ্গীকার নেয়। কিয়ামতের আগে তিনি মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেন। ফলে তার মাধ্যমেই রেসালাতের পরিসমাপ্তি করেন। তাঁর মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা হতে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, অজ্ঞতা হতে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর রেসালাতের দ্বারা অন্ধের চোখ, বধিরের

কান ও অভদ্রের অন্তর খুলে দিয়েছেন। অন্ধকার পৃথিবী তাঁর রেসালাতের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে, শতধাবিভক্ত অন্তরসমূহ একত্রিত হয়েছে, তাঁর দ্বারা বাঁকা জাতিকে ঠিক করা হয়েছে, উজ্জ্বল পথ স্পষ্ট করা হয়েছে, কল্যাণের জন্য তাঁর বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তাঁর উপর থেকে ভারী বোঝা অপসরণ করেছেন এবং তাঁর খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। পক্ষান্তরে যে তাঁর আদেশ অমান্য করবে তার জন্য লাঞ্ছণা ও অপমান নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এমন এক সময় প্রেরণ করেন, যখন নবী ও রাসূলগণের আগমণের দীর্ঘ বিরতিকাল চলছিল, আসমানী কিতাবসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, আল্লাহর বাণী ও শরীয়তের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়েছিল, প্রত্যেক গোত্র তাদের অন্যায় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করত, আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের উপর তাদের প্রবৃত্তি ও বাতিল উক্তি দ্বারা ফায়সালা করত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টিকূলকে হেদায়েত করলেন ও সঠিক পথ দেখালেন, মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসলেন, সৎ ও অসৎ ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করে দিলেন। ফলে যে তাঁর পথ অবলম্বন করল, সে সঠিক পথ পেল, আর যে তাঁর পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করল, সে পথভ্রষ্ট হল ও সীমালঙ্ঘন করল। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপর এবং সমস্ত নবী ও রাসূলগণের উপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত "মাজমূউল ফাতাওয়া কিতাবের" কায়েদাতু ফী উজূবিল ই'তেসামি বির রিসালাহ" অধ্যায়ঃ ১৯শ খণ্ড; ৯৯-১০২ নং পৃষ্ঠা এবং দেখুন ঃ লাওয়ামিউল আনওয়ারুল বাহীমাহ ঃ ২য় খণ্ড; ২৬১-২৬৩ নং পৃষ্ঠা)

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে রেসালাতের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল ঃ

(১) নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্ট ও পালিত জীব। তার উপর সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানা আবশ্যক এবং তার জানা উচিত যে, তিনি তার কাছ থেকে কী চান? কেন তাকে সৃষ্টি করেছেন? এগুলো জানার ক্ষেত্রে মানুষ স্বনির্ভর হতে পারে না। আর নবী ও রাসূলগণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তারা যে হেদায়েতের নূর নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জানা ব্যতীত তা জানার কোন পথ নেই।

(২) মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। শরীরের খাবার হচ্ছে যথাসম্ভব খাদ্য ও পানীয়। আর আত্মার খোরাক হল– তার সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করা। এটাই হচ্ছে সঠিক দ্বীন ও সৎ আমল। আর নবী ও রাসূলগণ তো সঠিক দ্বীন নিয়ে এসেছেন এবং সৎ কাজের শিক্ষা দিয়েছেন।

(৩) মানুষ স্বভাবগতভাবেই ধার্মিক। তাকে কোন না কোন ধর্মে দীক্ষিত হতে হবেই। ফলে এই দ্বীন সঠিক হওয়া আবশ্যক। আর সঠিক ধর্ম পেতে হলে নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস আনা এবং তারা যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস আনা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

(৪) দুনিয়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং আখেরাতে জান্নাত ও তার নেয়ামত লাভের পথ ও পদ্ধতি জানতে মানুষ মুখাপেক্ষী।

(৫) মানুষ নিজে অত্যন্ত দুর্বল এবং অসংখ্য শত্রু বেষ্টিত। যেমন; শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, দুষ্ট বন্ধু তাকে অসৎ পরামর্শ দেয়। যার কারণে তার এমন কিছুর প্রয়োজন যা তাকে এ ধরণের শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবে। আর নবী ও রাসূলগণ সেই পথের শেষ সীমা পর্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করে গেছেন।

(৬) মানুষ স্বভাবতই শহর প্রিয়। ফলে অন্য মানুষের সাথে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা ও চলাফেরার জন্য অবশ্যই কোন না কোন নিয়মনীতি বা বিধানের প্রয়োজন, যাতে করে তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাছাড়া তাদের জীবন বন্য জীবনের মত হত। সেই বিধানটি যেন অবশ্যই কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা প্রদর্শন না করে সবার অধিকার রক্ষা করে। আর এ ধরণের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত কেউ আনতে পারে না।

(৭) মানুষ ঐ জিনিস জানার প্রতি মুখাপেক্ষি যা তার আত্মপ্রশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং বাস্তব সফলতার কারণ শিক্ষা দেয়। আর নবী ও রাসূলগণ তো এদিকেই আহ্বান করেন।

নবী রাসূলগণের প্রতি সৃষ্টিকুলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার পর আখেরাত বা পরকাল সম্পর্কে দলীল প্রমাণাদীসহ আলোচনা করা উত্তম মনে করছি।

আখেরাত বা পরকাল

প্রত্যেক মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সে মৃত্যু বরণ করবে সুনিশ্চিত! কিন্তু মৃত্যুর পরে তার ঠিকানা কোথায় হবে? সে কি সৌভাগ্যবান, নাকি দুর্ভাগ্যবান?

বহু জাতি ও জনগোষ্ঠী বিশ্বাস পোষণ করে যে, মরণের পরে তাদেরকে আবার পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদের সকল কর্মের হিসাব নেয়া হবে। কর্ম যদি ভাল হয় তবে তার প্রতিদানও ভাল হবে, আর কর্ম যদি খারাপ হয় তবে তার প্রতিদানও খারাপ হবে। (দেখুন ঃ আল জাওয়াবুস সহীহ ঃ ৪র্থ খণ্ড, ৯৬ নং পৃষ্ঠা)

আর এ বিষয়টিকে অর্থাৎ পুনরুত্থান ও হিসাবকে সুস্থ বিবেক মেনে নেয় এবং ইলাহী শরীয়ত তাকে সহায়তা করে। এর ভিত্তি তিনটি মূলনীতির উপরঃ

(১) মহান আল্লাহর জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতা প্রমাণ করা।

(২) মহান আল্লাহর ক্ষমতার পরিপূর্ণতা প্রমাণ করা।

(৩) এবং তাঁর হিকমতের পরিপূর্ণতা প্রমাণ করা। (দেখুন; ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম রচিত "আল ফাওয়াইদ" ঃ ৬-৭)

একে প্রমাণ করার জন্য যুক্তি ও উক্তি ভিত্তিক (আকলী ও নাক্বলী) অনেক দলীলের সমাবেশ ঘটেছে। কিছু দলীল নিম্নে পেশ করা হলঃ

(১) ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টি দ্বারা মৃতকে জীবিত করার প্রমাণ গ্রহণ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأحقاف : ٣٣]

অর্থাৎঃ তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে তিনি কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। হ্যাঁ, অবশ্যই! নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আহক্বাফ ৪৬ ঃ ৩৩)

তিনি আরো বলেনঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ [يس : ٨١]

অর্থাৎঃ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৮১)

(২) পূর্ববর্তী কোন দৃষ্টান্ত ছাড়াই তাঁর মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারা দ্বিতীয়বার তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার দলীল গ্রহণ। আবিষ্কার করতে যিনি ক্ষমতাবান, পুনর্বার তৈরি করতে তিনি তো আরো বেশী সক্ষম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (الروم:٢٧)

অর্থাৎঃ আর তিনি সৃষ্টিকে (প্রথমবার) অস্তিত্বে আনয়ন করেন অতঃপর তিনি একে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আর তাঁরই জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা। (সূরা রূম ৩০ ঃ২৭)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (يّس: ٧٨- ٧٩)

অর্থাৎঃ আর সে আমার উদ্দেশ্যে উপমা পেশ করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; সে বলেঃ হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? যখন ওটা পচে গলে যাবে? বলুনঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ৭৮-৭৯)

(৩) এই পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট দ্বারা সর্বোত্তম অবয়বে মানুষ সৃষ্টি এবং এর গঠনে যে সব গোশ্ত, হাড্ডি, শিরা, স্নায়ু, ছিদ্র বা ফাঁকা, যন্ত্র, জ্ঞান, পরিচলনা ও দক্ষতাসমূহ ইত্যাদি আছে,

এগুলোর মাঝে মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতার বিরাট প্রমাণ রয়েছে।

(৪) ইহজগতে মৃতকে জীবিত করা দ্বারা আখেরাতে মৃতকে জীবিত করার উপর আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ দেয়া। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলগণের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সংবাদ যেমন– ইবরাহীম (عليه السلام) এবং ঈসা মাসীহ (عليه السلام)-এর হাতে আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করার ঘটনা। এগুলো ছাড়া আরো অনেক উপমা রয়েছে।

(৫) হাশর-পুনরুত্থান ও অনুরূপ কিছু বিষয়ের উপর তাঁর ক্ষমতা দ্বারা মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ। যেমন ঃ

ক - আল্লাহ মানুষকে বীর্যের ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ছিল, যার কারণে তা পতিত হওয়ার মজালাভে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অংশগ্রহণ করে। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা এই বীর্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে একত্রিত করেন, অতঃপর তা বের হয়ে স্থাপিত হয় মাতৃগর্ভের মজবুত এক নিবাসে, তারপর সেখানে আল্লাহ তা'য়ালা তা হতে মানুষ সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই বীর্য যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, তখন তিনি ওকে একত্রিত করে তা হতে এই মানুষ সৃষ্টি করেন, তারপর মৃত্যু বরণ করার ফলে, দ্বিতীয়বার যখন আবার তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন ওকে পুনরায় একত্রিত করতে বাধা কোথায়?

মহা প্রশংসিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ - أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (الواقعة : ٥٨-٥٩)

অর্থাৎঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (সূরা ওয়াক্বিআহ ৫৬ ঃ ৫৮-৫৯)

খ - বিভিন্ন প্রকার আকার-আকৃতির শস্যবীজ যদি সিক্ত বা ভেজা জমিনে পড়ে এবং তাকে মাটি ও পানি ঢেকে ফেলে, তাহলে আপাততঃ বিবেকের দাবী যে, ওগুলো পচে ও নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ মাটি ও পানির যে কোন একটিই নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, অতএব দুটি জিনিস একত্রিত হলে তো নষ্টের জন্য আরো বেশী সহজ! কিন্তু তা নষ্ট না হয়ে বরং

সংরক্ষিত অবস্থায় টিকে থাকে। অতঃপর যখন সিক্ততা আরো বেড়ে যায়, তখন শস্যবীজ ফেটে চারা গজায়। এগুলো কি পরিপূর্ণ শক্তি ও ব্যাপক হিকমতের প্রমাণ বহন করে না? সুতরাং এই ক্ষমতাবান ও মহা প্রজ্ঞাবান প্রভু বিচ্ছিন্ন ও টুকরো টুকরোকে একত্রিত করতে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জোড়া দিতে কিভাবে অক্ষম হবেন? আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (الواقعة: ٦٣ – ٦٤)

অর্থাৎঃ তোমরা যে বীজ বপন কর সে বিষয়ে চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি। (সূরা ওয়াক্বিআহ ৫৬ ঃ ৬৩-৬৪) এর অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (الحج:٥)

অর্থাৎঃ আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৫)

(৬) মহান সৃষ্টিকর্তা, যিনি শক্তিশালী, সর্বজ্ঞাত ও প্রজ্ঞাবান তিনি মানুষকে অযথা সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে নিরর্থক ছেড়ে দেবেন এ দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (ص:٢٧)

অর্থাৎঃ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মাঝে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফেরদের ধারণা তা-ই, সুতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সোয়াদ ৩৮ ঃ ২৭)

বরং তিনি মানুষকে মহান এক হিকমত ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات:٥٦)

অর্থাৎঃ আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ ৫৬)

সুতরাং এই মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর জন্য এটা সোভনীয় নয় যে, যারা তাঁর আনুগত্য করবে এবং যারা তাঁর নাফরমানী করবে তারা সবাই তাঁর কাছে সমান!

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (ص:٢٨)

অর্থাৎঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে কি আমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করবো? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করবো? (সূরা সোয়াদ ৩৮ ঃ ২৮)

সে কারণে তাঁর হিকমতের পূর্ণাঙ্গতা এবং প্রবল শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব হল যে,তিনি ক্বিয়ামত দিবসে সকল মানুষকে তাদের কর্মের প্রতিদান দেয়ার জন্য তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। ফলে নেককারকে সওয়াব আর পাপীকে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ (يونس:٤)

অর্থাৎঃ তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, যাতে তিনি যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে ইনসাফ মতো প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা ইউনুসঃ ৪; দেখুন ঃ ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) প্রণীত "আল ফাওয়ায়িদ; ৬, ৯ নং পৃষ্ঠা এবং ইমাম আর রাযীর "তাফসীরুল কাবীর; ২য় খণ্ড, ১১৩ - ১১৬ নং পৃষ্ঠা)।

ব্যক্তি ও সমাজে কিয়ামত দিবসকে বিশ্বাস করার অনেক উপকরীতা রয়েছে, এর কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১ - ঐ দিন সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী হবে এবং শাস্তির ভয়ে তাঁর নাফরমানী করা হতে দূরে থাকবে।

২ - আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখার মধ্যে মুমিনদের জন্য শান্ত্বনা রয়েছে, কারণ পার্থিব দুনিয়ার যে সব কল্যাণ তার ছুটে গেছে তার পরিবর্তে সে আখেরাতের কল্যাণ ও তার সওয়াব আশা করবে।

৩ - আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখার ফলে মৃত্যুর পরে কোথায় তার ঠিকানা হবে এবং সে তার কর্মের প্রতিফল পাবে, মানুষ তা জানতে পারে। কর্ম যদি ভাল হয় তবে তার প্রতিদানও ভাল হবে, আর কর্ম যদি খারাপ হয় তবে তার প্রতিদানও খারাপ হবে।

আরো জানতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের জন্য (আল্লাহর সামনে) তাকে দাঁড় করানো হবে, যাদের উপর সে জুলুম করেছে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে এবং যাদের প্রতি সে জুলুম ও বাড়াবাড়ী করেছে তাদের জন্য তার নিকট হতে বান্দার হক্ব আদায় করা হবে।

(৪) আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষের জন্য এমন সময় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয় না। এটা এ কারণে যে, আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষকে তার গোপনে ও প্রকাশ্যে অন্যের অনিষ্ট করা হতে বিরত রাখতে বাধ্য করে। বরং এই বিশ্বাস স্থাপন তার সীনার ঐ স্থান পর্যন্ত বিদ্ধ হয় (প্রভাব ফেলে) যেখানে সে থাকে এবং খারাপ নিয়তের উপর আঘাত করে যদি তা পাওয়া যায়, ফলে জন্ম হওয়ার পূর্বেই তাকে শেষ করে ফেলে।

(৫) আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অপরের প্রতি জুলুম এবং তাদের হক্ব নষ্ট করা হতে মানুষকে বিরত রাখে, সুতরাং মানুষ যদি আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তবে তারা পরস্পরে জুলুম করা হতে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের হক্বসমূহও রক্ষা পাবে।

(৬) আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষকে এমন করে দেয় যে, সে মনে করে দুনিয়ার ঘর-সংসার জীবনের একটি স্তর মাত্র। তা পূর্ণাঙ্গ জীবন নয়।

এই অনুচ্ছেদের শেষে সঙ্গত মনে করছি যে, আমেরিকান নাগরিক ওয়াইন বেট নামক এক খ্রীস্টানের একটি উক্তিকে প্রমাণসরূপ পেশ করি। সে এক গির্জায় কাজ করতো, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখার ফলাফল উপলব্ধি করে। তিনি বলেন ঃ আমি এখন এমন ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানি; যা আমার জীবনকে খুব ব্যস্ত করে রেখেছিল। প্রশ্ন ৪টি হলঃ আমি কে? আমি কী চাই? আমি কেন এসেছি? আমার গন্তব্য কোথায়? (মাজাল্লাতুদ্দা'ওয়া আস্ সঊদিয়্যাহ ঃ ১৭২২ নং সংখ্যা, তারিখ : ১৯/ ৯/ ১৪২০ হিজরী, ৩৭ নং পৃষ্ঠা)

রাসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালাঃ

সমস্ত নবী ও রাসূল সম্মিলিতভাবে কতিপয় মৌলিক নীতিমালার[৪] প্রতি আহ্বানের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। যেমনঃ আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তেমনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের আদেশ করা, যার কোন অংশীদার নেই। আর তাঁর পথ অনুসরণ করা এবং অন্য পথসমূহের অনুসরণ না করা। চার প্রকার জিনিসকে হারাম করা, যথাঃ প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল প্রকার অশ্লীলতা ও গুনাহ, অন্যায়ভাবে জুলুম করা, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন এবং প্রতিমা ও মূর্তি পুজা করা। আর আল্লাহ তা'য়ালার স্ত্রী, সন্তান, অংশীদার, সমকক্ষ ও সাদৃশ্য আছে ইত্যাদি হতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অসত্য বলা হতে তাঁকে পবিত্র করা। তেমনি সন্ত ানাদি ও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে হারাম করা। সূদ ও ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা হতে নিষিদ্ধ করা। অঙ্গীকারসমূহ, পরিমাপ

৪. এই নীতিমালার দিকে ইঙ্গিত এসেছে সূরা বাক্বারার ২ ঃ ২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াতদ্বয়, সূরা আনআ'মের ১৫১ ও ১৫৩ নং আয়তদ্বয়, সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৩৩ নং আয়াত এবং সূরা বানী ইসরাঈলঃ ২৩ ও ৩৭ নং আয়াতদ্বয়ের মধ্যে।

ও ওজন পূরণ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং কথা ও কাজে সততা অবলম্বনের আদেশ করা। অনুরূপভাবে অপচয় ও অহঙ্কার করা হতে এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করা। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম[৫] (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ "মৌলিকগতভাবে সম্পূর্ণ শরীয়তটাই এক ও অভিন্ন, যদিও তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যার সৌন্দর্যতা অন্তরের মাঝে পোঁতা বা সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যদি তা যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা ব্যতীত অন্যের উপর আসে, তবে তা হিকমত, কল্যাণ ও রহমত হতে বেরিয়ে যাবে। বরং শরীয়ত যা নিয়ে এসেছে তার বিপরীতে তা আসবে এটা অসম্ভব।"

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ [المؤمنون : ٧١]

অর্থাৎঃ সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো, তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো, পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি: কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ ৭১)

আর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এটা কিভাবে জায়েয হবে যে, মহা শাসনকর্তার শরীয়তকে যা সে নিয়ে এসেছে তার বিপরীতে ফিরিয়ে দেবে? (মিফতাহু দারুস্ সাআ'দাহঃ ২য় খণ্ড, ৩৮৩ নং পৃষ্ঠা এবং দেখুন "আল জওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহঃ ৪র্থ খণ্ড, ৩২২ নং পৃষ্ঠা, ও শাইখ সাফারিনীর "লাওয়ামিউল আনওয়ার" ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩)

আর এ কারণেই সকল নাবীগণের দ্বীন ছিল এক ও অভিন্ন, যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ [المؤمنون : ٥١ ، ٥٢]

৫. তিনি মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর বিন আইয়ুব আয্ যিরয়ী; ৬৯১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন, তিনি ইসলামের একজন বড় মাপের আলেম, তাঁর রচিত অসংখ্য কিতাব রয়েছে।

অর্থাৎঃ হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি পূর্ণ অবগত। আর তোমাদের এই জাতি একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। (সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ ৫১, ৫২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ [الشورى : ١٣]

অর্থাৎঃ তিনি তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন এমন এক দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (عليه السلام)-কে, আর যা আমি ওহী করেছিলাম আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম (عليه السلام), মূসা (عليه السلام), ও ঈসা (عليه السلام)-কে, এই বলে যে, তোমরা এই দ্বীনকে (তাওহীদকে) প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। (সূরা শূরা ৪২ ঃ ১৩)

বরং দ্বীনের উদ্দেশ্য হলঃ বান্দাগণকে যে কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে সে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। আর তা হচ্ছে– একমাত্র তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করা, যার কোন অংশীদার নাই। সুতরাং তাদের উপর কিছু হক্ব ও ওয়াজিব ইবাদতকে বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা পালন করা তাদের জন্য ওয়াজিব। আর তাদেরকে এমন সব মাধ্যম দিয়ে সাহায্য করেছেন, যা তাদেরকে এই লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। যাতে করে আল্লাহর পন্থা মোতাবেক তাদের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি ও উভয় জগতের কল্যাণ বাস্তবায়ন হয়, যা বান্দাকে সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করবে না এবং এমন কঠিন কষ্টকর রোগ দ্বারা তার ব্যক্তিত্বের প্রতি আঘাত করবে না, যা তাকে তার স্বভাব, তার আত্মা এবং তার চতুর্পার্শ্বের জগতের মাঝে সংঘাত লাগিয়ে দেবে। সুতরাং সমস্ত রাসূলগণ আল্লাহর এমন এক দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন, যা মানবজাতির উদ্দেশ্যে আক্বীদার মূল বুনিয়াদসমূহ পেশ করে, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় এবং এমন এক শরীয়ত পেশ করে, যার উপর তারা সারা জীবন চলতে পারে। সে জন্য তাওরাতে আক্বীদা বা বিশ্বাস ও শরীয়ত ছিল এবং তার অনুসারীদেরকে এর মাধ্যমে মীমাংসা নিস্পত্তির চাপ দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ (المائدة:٤٤)

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে হেদায়েত ও আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তা অনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করতেন, আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণও ----। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৪)

অতঃপর ঈসা মাসীহ (عليه السلام) ইঞ্জিল নিয়ে আসেন, যাতে ছিল হেদায়েত ও আলো আর তার পূর্বে যে তাওরাত ছিল তার সত্যায়নকারী।

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْأِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ (المائدة:٤٦)

অর্থাৎঃ আর আমি তাদের পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এ অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে, সে তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন এবং আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি, যাতে হেদায়েত এবং আলো ছিল। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৬)

অতঃপর মুহাম্মাদ (ﷺ)পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আগমন করেন, যা পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের তত্ত্বাবধায়ক এবং রহিতকারী। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে আল কুরআন দেন, যা তাঁর পূর্বের সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (المائدة:٤٨)

অর্থাৎঃ আর আমি এ কিতাব (কুরআন)-কে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি হক্বের সাথে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং

ঐসব কিতাবের সংরক্ষকও; অতএব আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৮)

আর আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর সাথে মুমিনগণও এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, যেমন তাঁর পূর্বেকার সকল নবী ও রাসূলগণ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (البقرة:٢٨٥)

অর্থাৎঃ রাসূল তাঁর প্রতিপালক হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করেন); তাঁরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগনের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না, আর তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও স্বীকার করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। (সূরা বাক্বারাহ ২ ঃ ২৮৫)

চিরস্থায়ী রিসালাত[৬]

ইতিপূর্বে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, জারাদেশি ও পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ধর্মসমূহের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তাতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মানবজাতির অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যায়। (অত্র কিতাবের "বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা" দ্রষ্টব্য)

৬. বিস্তারিত দেখুনঃ শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী রচিত "আর রাহীকুল মাখতূম"।

কেননা যখনই দ্বীন বিনষ্ট হবে তখনই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও ধ্বংস অনিবার্য। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যাপকতা লাভ করে। স্বেচ্ছারিতা প্রকাশ পায়, আর মানবসমাজ সম্পূর্ণ কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করতে থাকে। কুফর ও অজ্ঞতার কারণে অন্তরসমূহও অন্ধকারাচ্ছন হয়ে পড়ে, চরিত্র কুলসিত হয়, মানহানি ঘটে, অধিকার লঙ্ঘিত হয়, জলে ও স্থলে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এমনকি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সে অবস্থাকে নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, সে সময় মানবজাতি মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছিল এবং তাদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এক মহান সংস্কারকের মাধ্যমে সংশোধন করার ইচ্ছা করলেন, যিনি নবুওয়াতের মশাল ও হেদায়েতের চেরাগ বহন করবেন; যাতে করে তিনি মানবজাতির পথকে আলোকিত করতে পারেন এবং তাদেরকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করেন। এমন সময়েই আল্লাহ তায়ালা মক্কা মুকাররমা হতে চিরন্তন নবুওতের জ্যোতি উদ্ভাসিত করার ঘোষণা করলেন, যেখানে রয়েছে মহান কা'বা ঘর। আর তখনকার পরিবেশ মানবজাতির অন্য সব বিভিন্ন পরিবেশের সাথে যেমন– শিরক, মুর্খতা, যুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির দিক হতে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার পরেও অন্যদের থেকে তা ছিল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ আলাদা; যেমন ঃ

(১)-এর পারিপর্শ্বিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছ। গ্রীক, রুমানীয় বা ভারতীয় দর্শনের কালিমার প্রভাব এর উপর বিস্তার লাভ করেনি। প্রত্যেক বক্তিই বাকপটুতা, তীক্ষ্ম মেধা ও অভিনব স্বভাবের অধিকারী ছিল।

(২) এটা বিশ্বের কেন্দ্রে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এসমস্ত অঞ্চলে এই চিরন্তন সত্য বাণী পৌঁছার ও দ্রুত বিস্তার লাভ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

(৩) এটা একটা নিরাপদ এলাকা। আবরাহা যখন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, তখন আল্লাহ নিজেই এটাকে রক্ষা করেন এবং এর প্রতিবেশী রোম ও পারস্যের সম্রাটরাও এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি। বরং উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসায়ীরাও নিরাপদ ছিল। এ সবই ছিল এই সম্মানিত নবীর আগমনের লক্ষণ মাত্র।

আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত নেয়ামত প্রাপ্তদের উল্লেখ করে এরশাদ করেন ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [القصص : ٥٧]

অর্থাৎঃ আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি! যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। (সূরা কাসাস ২৮ ঃ ৫৭)

(৪) এই অঞ্চলটি মরুময় পরিবেশযুক্ত। যা এর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন প্রশংসামুলক গুণের অধিকারী করেছিল। যেমনঃ দানশীলতা, প্রতিবেশীত্ব রক্ষা, আত্মসম্মান বোধ ইত্যাদি অনন্য বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছিল, যাতে এই স্থানটিই চিরন্তন রিসালতের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়। এই মহান স্থান (যারা বাগ্মিতা ও অলঙ্কারশাস্ত্র এবং উত্তম চরিত্রের কারণে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং যাদের বিশেষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ছিল সেই বিখ্যাত কুরাইশ গোত্র হতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নির্বাচিত করেন, যাতে করে তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূলের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ৫৭০ খৃঃ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তাঁর পিতা মারা যাওয়ায় ইয়াতীম হিসেবেই বড় হতে থাকেন। তারপর ছয় বছর বয়সে তাঁর মা ও দাদা উভয়েই মারা যান। পরে তাঁর চাচা আবূ তালেব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। শৈশবেই তাঁর প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাঁর অভ্যাস, চরিত্র ও স্বভাব সবই যেন স্বজাতির অভ্যাসের চেয়ে ভিন্ন ছিল। মিথ্যা কথাবার্তা বলতেন না, কাউকে কষ্ট দিতেন না। সত্যবাদিতা, সংযমশীলতা ও আমানতদারীতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে তাঁর গোত্রের অনেক মানুষই তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদ আমানত ও জমা রাখত। আর তিনিও সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন যেমন তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর সম্পত্তির সংরক্ষণ করতেন। যার কারণে তারা তাকে আল আমীন উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি খুব লাজুক ছিলেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর হতে কারো সামনে তিনি তাঁর উদাম শরীর প্রকাশ করেননি। নিষ্কলুষ ও পরহেযগার হওয়ার কারণে তিনি তাঁর স্বজাতির মধ্যে মূর্তিপুজা, মদপান ও খুনাখুনি দেখে ব্যথিত হতেন। যে সকল কাজ তার কাছে ভাল মনে হত সেগুলোতে তিনি সহযোগীতা করতেন আর

অন্যায়মূলক কাজে তাদের থেকে দূরে থাকতেন। ইয়াতীম ও বিধবাদের সাহায্য করতেন। ক্ষুধার্তকে খাবার দিতেন। অবশেষে যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, তখন সমাজের ফেৎনা-ফাসাদ ও ভ্রান্তির কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, লোকালয় মুক্ত পরিবেশে একাকী তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে মনযোগ দেন এবং তাঁর কাছে সঠিক পথের সন্ধান চান।

এ রকম অবস্থাতেই একদিন তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলাহী বাণী নিয়ে অবতরণ করেন। আর তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এই দ্বীনকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। আর তাদেরকে তাদের প্রভুর ইবাদত করার এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের বর্জন করার আহ্বান করেন। এভাবেই দিনের পর দিন ও বছরের পর বছর শরীয়তের হুকুম-আহকাম নিয়ে ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতির জন্য এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেন এবং তাতে তার নেয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ করেন। এরপর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দায়িত্ব পূর্ণ হলে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। এর মধ্যে ৪০ বছর নবুওয়াত পূর্ব জীবন এবং নবী ও রাসূল হিসেবে ২৩ বছর অতিবাহিত করেন। যে ব্যক্তি নবীগণের অবস্থাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং তাঁদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবে সে নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যে, অন্যান্য নবীদের নবুওয়াত যেসব পদ্ধতিতে সাব্যস্ত হয়েছে, তা দ্বারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়াত সাব্যস্ত করা অধিক যুক্তিসংগত। আপনি যদি লক্ষ্য করেন মুসা (عليه السلام) ও ঈসা (عليه السلام)-এর নবুওয়াত কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে জানতে পারবেন যে, তা "মুতাওয়াতির" বা ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।

আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়াত যে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে তা অধিকতর ব্যাপক, নির্ভরযোগ্য ও সত্যের মাপকাঠিতে অনেক বেশী নিকটবর্তী। অনুরূপভাবে নবীগণের মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ যে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে তা পরস্পর সামঞ্জস্যপুর্ণ। বরং তা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক। কারণ তাঁর নিদর্শনসমূহ অনেক। বরং তাঁর সব চেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে– এই মহা গ্রন্থ আল কুরআন। যা লেখা ও শোনা উভয় দিক হতে 'মুতাওয়াতির' পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

হযরত মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালাম যা নিয়ে এসেছেন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যে সঠিক আক্বীদা ও যথাযথ বিধিবিধানসমূহ এবং উপকারী জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে এসেছেন– এই দুইয়ের মাঝে যদি কেউ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে, তাহলে সে অবশ্যই জানতে পারবে যে, এসবই এক প্রদীপ থেকে আগত। আর তা নবুওয়াতের প্রদীপ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নবীগণের অনুসারী ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসারীর মাঝে তুলনা করবে, জানতে পারবে যে, তাঁরা মানুষের উপকার করার ক্ষেত্রে উত্তম মানুষ ছিলেন। বরং তাঁরা নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণে তাদের পরবর্তীদের তুলনায় অধিক অগ্রগামী ছিলেন। কারণ তারাই তাওহীদের প্রচার করেছেন, ন্যায় পরায়ণতার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন এবং তারা দুর্বল ও দরিদ্রদের উপর দয়াশীল ছিলেন। আপনি যদি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওতের প্রমাণ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বর্ণনা জানতে চান, তাহলে আমি আপনার সামনে ঐ সমস্ত দলীল প্রমাণাদী উপস্থাপন করবো, যা আলী বিন রিবন তিবরী খীষ্টান থাকা অবস্থায় পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে সে একারণেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর সেই দলীল-প্রমাণাদী নিম্নরূপঃ

১। এ ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য সমস্ত নবীদের মত শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা বর্জন করতে আহ্বান করেন।

২। তিনি এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী জাহির করেন, যা নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ নিয়ে আসতে পারে না।

৩। তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে যে সব খবর দিয়েছেন, সেগুলো আজ হুবহু সংঘটিত হচ্ছে।

৪। তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার রাজত্ব সংক্রান্ত কিছু ঘটনাগুচ্ছের সংবাদ দিয়েছেন, তা হুবহু সংঘটিত হচ্ছে যেমন তিনি সংবাদ দেন।

৫। মুহাম্মাদ (ﷺ) যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিয়ে প্রেরিত হন– তা নবুওয়াতের একটি বড় নিদর্শন। কারণ তা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গতর কিতাব। আল্লাহ তা'য়ালা তা এমন এক নিরক্ষর ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করেন, যিনি পড়তে ও লিখতে জানেন না। অথচ তিনি বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতদেরকে কুরআনের অনুরূপ অথবা কুরআনের সূরার মত একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে

আসার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। (কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তা সক্ষম হয়নি, আর কোন দিন হবেও না) আরো কারণ হচ্ছে; স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর তার মাধ্যমে সঠিক আকীদা বা বিশ্বাসের সংরক্ষণ করেন এবং তাতে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত করেন ও তার মাধ্যমে সর্বোত্তম জাতি প্রতিষ্ঠা করেন।

৬। তিনি হলেন নবীগণের সমাপ্তকারী, ফলে তিনি প্রেরীত না হলে ঐ সমস্ত নবীগণের নবুওয়াত বাতিল হয়ে যেত যাঁরা তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

৭। সমস্ত নবীগণ দীর্ঘ যুগ ধরে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বাভাস দেন এবং তাঁর আগমন, তাঁর শহর, অনেক জাতি এবং শাসক গোষ্ঠির তাঁর ও তাঁর উম্মতের বশ্যতা স্বীকার এবং তাঁর দ্বীনের বিস্তারলাভ ইত্যাদির গুণাগুণ বর্ণনা করেন।

৮। যে সমস্ত জাতি তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে তাঁর বিজয় লাভ করাটাও নবুওয়াতের একটি লক্ষণ; যার ফলে অন্য ব্যক্তির পক্ষে এটা দাবী করা অসম্ভব যে, সে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরীত দূত। বরং সে মিথ্যাবাদী। তারপর আল্লাহ তাঁকে বিজয় ও দৃঢ়তা, শত্রুর উপর প্রাধান্য, দাওয়াতের প্রসার এবং অসংখ্য অনুসারী দিয়ে সাহায্য করেন; সুতরাং এই সব একমাত্র সত্য নবীর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়।

৯। তাঁর মাঝে যে ধার্মিকতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যবাদীতা, প্রশংসনীয় চরিত্র এবং নিয়ম-নীতি ও শরীয়ত পালনের গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল, তা সত্য নবী ছাড়া আর কারো মাঝে একত্রিত হয় না।

অতঃপর তিনি এই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপন করার পর বলেনঃ এগুলো হল স্পষ্ট গুণাবলী ও যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণাদী। সুতরাং যে ব্যক্তির মাঝে এগুলো প্রকাশ পায়, তার জন্য নবুওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়, তার মিশন ও দাবী সফল হয় এবং তাঁকে বিশ্বাস করা অপরিহার্য হয়। আর যে ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করল, তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল এবং তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ধ্বংস হল। (আলী বিন রিবন তিবরী লিখিত "আদদ্বীন ওয়াদ্ দাওলা ফী ইসবাতি নবুয়্যতে নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ﷺ; ৪৭ নং পৃষ্ঠা এবং দেখুন ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত "আল্ ই'লাম" ৩৬২ নং পৃষ্ঠা এবং তার পরে----)

অবশেষে আপনার উদ্দেশ্যে দু'টি সাক্ষ্য বর্ণনা করে এই অনুচ্ছেদের ইতি টানবো। একটি হচ্ছে অতীতের সেই রোম সম্রাটের সাক্ষ্য যিনি মুহাম্মাদ ﷺ এর সমসাময়িক ছিলেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জন সন্ট নামক সাম্প্রতিক কালের এক ইংরেজ খ্রীষ্টানের সাক্ষ্য ঃ

প্রথমতঃ রোম সম্রাট হিরাকলের সাক্ষ্য– ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আবূ সুফিয়ানের ঐ সংবাদ বর্ণনা করেন যখন তাকে রোমের বাদশা ডেকে জিজ্ঞেস করে। এ প্রসঙ্গে (বাদশাহ ও তার মাঝে) যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল তার বিবরণ তিনি (ইমাম বুখারী) ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন। আর তিনি বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান বিন হারব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হেরাকল তাকে একটি কুরাইশ দলের সঙ্গে ডেকে পাঠান। এই দলটি হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির আওতায় নিরাপত্তা লাভ হেতু শামদেশে গিয়েছিল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। (এটি হয়েছিল হিজরতের ৬ষ্ঠ বছর এবং তা ১০ বৎসরের জন্য; দেখুন ফাতহুল বারী; ৩৪ নং পৃষ্ঠা) তারা সবাই ঈলিয়া নামক স্থানে (শামদেশে) তার নিকট উপস্থিত হলেন। হেরাকল তাদেরকে তার দরবারে আহ্বান করলেন। ঐ সময় তার পাশে রোমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি তার দোভাষীর মাধ্যমে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন তাঁর সঙ্গে আপনাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ? আবূ সুফিয়ানের বর্ণনা যে, আমি বললাম, আমি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। হেরাকল বললেনঃ তাকে আমার নিকট নিয়ে এস এবং তার সঙ্গী সাথীদেরকেও তার পেছনে বসাও।

অতঃপর হেরাকল তার দোভাষীকে বললেনঃ তুমি তাদেরকে বল– আমি এই ব্যক্তিকে উক্ত নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ফলে সে যদি আমাকে মিথ্যা বলে তবে তারাও যেন তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে।

আবূ সুফিয়ান বললঃ আল্লাহর কসম! মিথ্যা বলার কারণে আমাকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করার ভয় যদি না থাকত তবে অবশ্যই আমি তাঁর (নবী ﷺ) সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। এরপর তাঁর সম্পর্কে হেরাকল আমাকে প্রথম যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন তা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ কেমন? আমি বললামঃ তিনি উচ্চ বংশোদ্ভূত।

হেরাকল বললেনঃ এমন কথা তাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি বলেছিল? আমি বললামঃ না।

হেরাকল বললেনঃ তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিল? আমি বললামঃ না।

হেরাকল বললেনঃ আচ্ছা তবে সম্মনিত লোকজন তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকজন? আমি বললামঃ বরং দুর্বল লোকজন।

হেরাকল বললেনঃ এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমছে? আমি বললামঃ কমছে না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হেরাকল বললেনঃ এই দ্বীন গ্রহণের পর কোন ব্যক্তি কি দ্বীনের প্রতি রাগ করে (বিদ্রোহী হয়ে) দ্বীন ত্যাগ করেছে? আমি বললামঃ না।

হেরাকল বললেনঃ তিনি যখন থেকে এসব কথা বলছেন তার পূর্বে কি তাঁকে তোমরা কোন মিথ্যার সাথে জড়িত দেখেছ? আমি বললামঃ না।

হেরাকল বললেনঃ তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? আমি বললামঃ না, তবে এখন আমরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছি। জানি না এই ব্যাপারে তিনি এরপর কী করবেন? এই প্রসঙ্গে আবূ সুফিয়ান বলেছেন যে– এই বাক্যটি ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর বিপক্ষে কিছু কথা প্রবেশ করানোর সুযোগ আমি পাইনি।

হেরাকল বললেনঃ কোন সময় তাঁর সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছো? আমি বললামঃ হ্যাঁ।

হেরাকল বললেনঃ তোমাদের এবং তাঁর যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ ছিল? আমি বললামঃ আমাদের ও তাঁর মাঝে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল বালতির ন্যায়; অর্থাৎ তিনি কখনো আমাদের পরাজিত করেছেন এবং আমরা কখনো তাঁকে পরাজিত করেছি।

হেরাকল বললেনঃ তিনি তোমাদেরকে কী করার নির্দেশ প্রদান করেন? আমি বললামঃ তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করতে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা বলতেন তা ছেড়ে দিতে, নামায কায়েম করতে, সত্যবাদিতা ও পুণ্যশীল আচরণ করতে এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন।

এরপর হেরাকল তার দোভাষীকে বললেনঃ তুমি তাকে (আবূ সুফিয়ানকে) বল যে, আমি তোমাকে উক্ত নবীর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছিলে যে, তিনি হচ্ছেন তোমাদের মাঝে উচ্চ বংশোদ্ভুত ব্যক্তি। আর এমনই নবীগণ তাঁদের নিজ জাতির মধ্যে উচ্চ বংশীয়ই হয়ে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, (নবুওয়াতের) একথা তাঁর বলার পূর্বে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি বলেছিল? তুমি উত্তর দিয়েছ 'না'। আমি বলছি, এর পূর্বে অন্য কেউ যদি এ কথা বলে থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি বলতাম যে, এই ব্যক্তি এমন এক কথার অনুকরণ করছে যা এর পূর্বে বলা হয়েছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি বাদশা ছিল। এর উত্তরে তুমি বলেছ 'না'। ফলে আমি বলছি, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশা থাকত, তাহলে বলতাম যে এই ব্যক্তি তার পিতৃব্যের রাজত্ব দাবী করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইতিপূর্বে তাঁকে কি তোমরা মিথ্যুক বলে দোষারোপ করেছ? উত্তরে তুমি বলেছ 'না'। আমি ভাল করেই জানি, যে লোক মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচার করে না সে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, সম্মানিত লোকজন তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকজন? উত্তরে তুমি বলেছ, দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর লোকেরাই নবীগণের অনুসারী হন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? উত্তরে তুমি বলেছ– না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ঈমানের বিষয়টি এমনই, অবশেষে তা পরিপূর্ণ হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এই দ্বীনে প্রবেশ করার পর কি কেউ বিরক্ত হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে? উত্তরে তুমি বলেছ– না, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে দ্বীনে প্রবেশকারী ব্যক্তির ঈমান যখন তার অন্তরের রূপালি পর্দার সাথে মিশে যায় তখন এরূপই হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? উত্তরে তুমি বলেছিলে– না, নবীদের ব্যাপার এরকমই হয়ে থাকে। তিনি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী ধরণের নির্দেশ প্রদান করেন? উত্তরে তুমি বলেছিলে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করতে বলছেন। অধিকন্তু তিনি তোমাদেরকে মূর্তিপুজা থেকে বিরত থাকতে, নামায কায়েম করতে, সত্যবাদিতা ও পূণ্যশীল আচরণ করতে নির্দেশ দেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, তুমি যা কিছু বলেছ তা যদি সঠিক ও সত্য হয়, তাহলে তিনি অতি শীঘ্রই আমার দুই পদতলের জায়গার অধিকার লাভ করবেন।

আমরা জানি যে, তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে আসবেন। যদি নিশ্চিত হতাম যে, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে সক্ষম হব, তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করতাম। আর যদি তাঁর নিকটে থাকতাম তাহলে তাঁর পদদ্বয় ধৌত করে দিতাম। এরপর তিনি রাসূল (ﷺ)-এর পত্রখানা নিয়ে আসতে বললেন, যা তিনি (ﷺ) দেহয়াহ মারফত বসরার প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে তিনি তাকে পত্রখানা দিলে হেরাকল তা পাঠ করেন। তাতে যা লেখা ছিল তা নিম্নরূপ;

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের (ﷺ) পক্ষ হতে রোম সম্রাট হেরাকল এর প্রতি-

সেই ব্যক্তির উপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক, যে হেদায়েতের অনুসরণ করে চলবে। অত:পর, আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে নিরাপদে থাকবেন ও আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার প্রজাবৃন্দেরও পাপ আপনার উপর বর্তিবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক কথার দিকে আসুন যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান। আর তা হচ্ছে এই যে– আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করব না এবং তার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করব না, আর

আমরা কেউই আল্লাহকে ছেড়ে একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। এতদসত্ত্বেও যদি মানুষেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান। (সহীহ বোখারী; কিতাবু বাদউল ওহী; ১ নং পরিচ্ছে)

দ্বিতীয়তঃ জন সন্ট নামক সাম্প্রতিককালের এক ইংরেজ খ্রীস্টানের সাক্ষ্যঃ

তিনি বলেনঃ ব্যক্তি ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাখ্যা ও তার মূলনীতি এবং সমতা ও তাওহীদের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ন্যায়বিচার সম্পর্কে অব্যাহতভাবে অবগত হওয়ার পর আমি আমার বিবেক ও আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে ইসলামে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ঐ দিন থেকে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি সকল ক্ষেত্রে ইসলামের একজন আহ্বানকারী ও তাঁর হেদায়েতের সুসংবাদদানকারী হবো।

খ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে গবেষণা ও তাকে নিয়ে গভীর চিন্তা করার পরই তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছেন। কারণ তিনি দেখতে পান, মানুষের জীবনে যে সমস্ত প্রশ্ন ঘুরপাক খায় তার অধিকাংশরই সঠিক উত্তর খ্রীষ্ট ধর্ম দিতে সক্ষম হয়নি। ফলে তখন তার মধ্যে সন্দেহ অনুপ্রবেশ করে। তারপর তিনি কমিউনিজম বা সাম্যবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু তাতেও তিনি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজে পাননি। তারপর ইসলাম নিয়ে গবেষণা ও গভীর চিন্তা করেন (এবং তাতে তিনি তার সার্বিক জীবনের সকল প্রশ্নের সমাধান পান) যার ফলে তিনি তার প্রতি বিশ্বাস আনেন এবং সেদিকে অন্যদেরকেও আহ্বান করেন। (মুবাশ্‌শির তিরাজি আল হুসাইনি লিখিত " আদদ্বীনুল ফিতরী আল আবাদী"; ২য় খণ্ড; ৩১৯ নং পৃষ্ঠ)

খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি

ইতোপূর্বের আলোচনায় আপনার কাছে নবুওয়াতের হাক্বীকত, তার নিদর্শন ও আলামতসমূহ,এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণসমূহ স্পষ্ট হয়ে গেছে। খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আপনার জানা প্রয়োজন যে, নীচের যে কোন একটি কারণে আল্লাহ সুবহানাহু কোন রাসূল প্রেরণ করেন ঃ

(১) নবীর রিসালত কোন একটি জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর এই নবীকে পার্শ্ববর্তী জাতীর নিকট তাঁর রিসালত প্রচার করার আদেশ দেয়া হয়নি। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আরেকজন রাসূলকে নির্দিষ্ট রিসালতের দায়িত্ব দিয়ে ঐ জাতির কাছে প্রেরণ করেন।

(২) বা পূর্ববর্তী নবীর রিসালাত বা বার্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের নিকট তাদের দ্বীনকে নবায়ন করার জন্য নবী প্রেরণ করেন।

(৩) বা পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত তার যুগেই কার্যকর ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে ছিল অকার্যকর, তখন আল্লাহ তা'য়ালা এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি সেই যুগ এবং স্থানের উপযুক্ত রিসালত ও শরীয়ত বহন করেন। তিনি তাকে পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন, যাতে করে তাঁর রিসালত থাকে জীবন্ত, যার দ্বারা মানুষ হয় উজ্জীবিত এবং সকল পরিবর্তন ও বিকৃতি হতে থাকে নির্মল। আর এ কারণেই তাঁকে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সকল রিসালতের পরিসমাপ্তি করেন। (দেখুনঃ আল আক্বীদাতু ত্বহাবিয়াহ ঃ ১৫৬ নং পৃষ্ঠা, লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহঃ ২য় খণ্ড; ২৬৯, ২৭৭ পৃষ্ঠা, মাবাদিউল ইসলামঃ ৬৪ নং পৃষ্ঠা)

আর আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য যে সব জিনিস নির্দিষ্ট করেছেন, তা হচ্ছেঃ তিনি সর্ব শেষ নবী, সুতরাং তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমেই রিসালতকে পূর্ণ এবং শরীয়তকে সমাপ্ত করেন। আর তাঁর নবুওয়াতের মাধ্যমেই তাঁর সম্পর্কে ঈসা মাসীহ (عليه السلام)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়, যেহেতু তিনি বলেনঃ "তোমরা কি কিতাবে (ইঞ্জিলে) কখনও পড়নি: নির্মাতারা যে পাথরকে প্রত্যাখ্যান করে, সেই অবশেষে এক প্রান্তের নেতা হয়ে যায়"। (ইঞ্জিল মাত্তা; ২১: ৪২)

আর খ্রীস্টান পুরোহিত ইবরাহীম খলীল, যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হন, এই উদ্ধৃতিকে স্বয়ং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর নিজের সম্পর্কে যা বলেন তার সাথে মিল গণ্য করেন। তিনি বলেন ঃ আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ এমন, যেমন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য গৃহ নির্মাণ করল কিন্তু গৃহের এক প্রান্তে একটি ইটের স্থান খালী রয়ে গেল। অতঃপর লোকেরা গৃহটিকে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল, আর বিস্মিত হয়ে

বলতে লাগল, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি? নাবী (ﷺ) বলেনঃ আমিই সেই ইট এবং আমি শেষ নবী। (দেখুনঃ ইবরাহীম খলীল আহমাদ রচিত "তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে মুহাম্মাদ (ﷺ)ঃ ৭৩ নং পৃষ্ঠা)। আর হাদীসটি মারফূ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রাযিয়ালাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী; কিতাবুল মানাক্বিব; অনুচ্ছেদ নং ১৭, হাদীসের শব্দগুলো তারই এবং ইমাম মুসলিমঃ কিতাবুল ফাযায়িল; হাদীস নং ২২৮৬, আর মুসনাদঃ ২য় খণ্ড, ২৫৬, ৩১২ নং পৃষ্ঠায়)

আর এ কারণেই মুহাম্মাদ (ﷺ) যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তাকে আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবসমূহের তত্ত্বাবধায়ক এবং তাদের রহিতকারী করেছেন। যেমন তাঁর শরীয়তকে পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের রহিতকারী করেছেন। আর তিনি তাঁর রিসালতকে হিফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে তা মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন কুরআনুল কারীম পঠিত ও লিখিত উভয়ভাবে বর্ণিত হয়। তেমনি নাবী (ﷺ)-এর কথা ও কর্ম জাতীয় সুন্নত এবং এই দ্বীনের বিধানাবলী তথা বাস্তবিক ব্যবহার, ইবাদত, সুন্নাত ও হুকুম-আহকামসমূহও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি কেউ সীরাত ও সুন্নাতের কিতাবাদি অনুসন্ধান করে,তবে সে জানতে পারবে যে, নাবী (ﷺ)-এর সাহাবাগণ (রাযিয়ালাহু আনহুম) মানবজাতির জন্য তাঁর যাবতীয় অবস্থাদি এবং সকল বাণী ও কর্মসমূহ হেফাজত করেছেন। সুতরাং তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদত, জিহাদ, যিকির ও ইস্তেগফার এবং তাঁর বদান্যতা ও সাহস, আপন সাথীদের সাথে ও তাঁর কাছে যে সব প্রতিনিধি ও আগন্তুক আসত তাদের সাথে তাঁর ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছু তাঁরা বর্ণনা করেন। যেমন তাঁরা তাঁর আনন্দ, বেদনা, প্রস্থান, অবস্থান, পানাহার ও পোষাকের বিবরণ, জাগরণ ও নিদ্রা ইত্যাদি বর্ণনা করেন। সুতরাং আপনি যদি এগুলো উপলব্ধি করেন, তবে নিশ্চিত হবেন যে, এই দ্বীন আল্লাহর তত্ত্বাবধানে তাঁর জন্য সংরক্ষিত। আর তখন জানবেন যে, তিনি নবী ও রাসূলদের শেষ, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এই রাসূলই হচ্ছেন নবীদের শেষ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

[الأحزاب : ٤٠]

অর্থাৎঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৪০)

আর নবী (ﷺ) তাঁর নিজ সম্পর্কে বলেন ঃ "আমি সমস্ত মানব জাতির নিকট প্রেরীত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমেই নবীদের সমাপ্ত হয়েছে। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ঃ ২য় খণ্ড, ৪১১, ৪১২ নং পৃষ্ঠা। সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল মাসাজিদ; হাদীস নং ৫২৩, আর হাদীসের শব্দগুলো তারই)। এগুলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় এবং তার হাক্বীকত, উৎস, রোকন ও স্তরসমূহের বর্ণনা।

ইসলাম শব্দের অর্থ

আপনি যদি ভাষার অভিধানসমূহ পর্যালোচনা করেন তাহলে জানতে পারবেন, ইসলাম শব্দের অর্থ হলঃ আনুগত্য, বিনয়, বশ্যতা, আত্মসমর্পণ এবং আদেশদাতার আদেশ ও নিষেধকারীর নিষেধকে বিনা আপত্তিতে পালন করা। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সত্য দ্বীনের নাম রেখেছেন ইসলাম, কারণ তা বিনা বাধায় আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ, যাবতীয় ইবাদতকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্ধারণ এবং তাঁর বার্তাকে সত্যায়ন ও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন বুঝায়। আর ইসলামের নামে মুহাম্মাদ (ﷺ) যে দ্বীন এনেছেন তার একটি চিহ্ন হয়ে যায়।

ইসলামের পরিচয়[৭]

দ্বীনের নামকরণ ইসলাম কেন করা হয়েছে? সমগ্র পৃথিবীতে যে সব দ্বীন রয়েছে তার নামকরণ, হয় এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামের দিকে সম্বন্ধ করে অথবা নির্দিষ্ট কোন জাতির দিকে সম্বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সুতরাং

৭. বিস্তারিত দেখুনঃ শাইখ হামূদ বিন মুহাম্মাদ আল্ লাহেম রচিত 'মাবাদিউল ইসলাম' এবং শাইখ ইবরাহীম হারব রচিত "দালীল মুখতাসার লি ফাহমিল ইসলাম" কিতাবদ্বয়।

নাসারাধর্মের (খ্রীস্টধর্ম) নামকরণ হয়েছে "আন্ নাসার" শব্দ হতে। বৌদ্ধধর্মের নামকরণ করা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের নামের উপর ভিত্তি করে। আর যারাদেশতিয়াহ ধর্ম এই নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে, কারণ তার প্রতিষ্ঠাতা ও ঝাণ্ডা বহনকারী হল যারাদিশ। এমনিভাবে ইয়াহুদী ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে "ইয়াহুযা" নামক এক পরিচিত গোত্রের মাঝে, ফলে তা ইয়াহুদীধর্ম নামকরণ হয়। এমনিভাবে অন্যান্য ধর্মগুলোর নামকরণও এভাবে হয়, কিন্তু ইসলাম সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ তাকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে অথবা নির্দিষ্ট কোন জাতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়নি। বরং এর নাম এমন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বহন করে যা ইসলাম শব্দের অর্থকে শামিল করে। আর এই নাম থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল, এই দ্বীন আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন মানুষ নির্দেশ দেয়নি এবং তা সকল জাতি বাদে কোন নির্ধারিত জাতির জন্য নির্দিষ্টও নয়। বরং এর লক্ষ্য সমস্ত বিশ্ববাসী যেন ইসলামের বৈশিষ্ট্যে সুসজ্জিত হয়। সুতরাং অতীত ও বর্তমান মানুষের প্রত্যেকে যারাই এই গুণে গুণান্বিত হয়, সেই মুসলমান। আর ভবিষ্যতেও যারা এই গুণে সুসজ্জিত হবে সেও মুসলমান হবে।

ইসলামের হাক্বীক্বত বা তাৎপর্য

একথা সবার জানা যে, এই পৃথিবীর সব কিছু নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মেনে নিজ নিজ গতিতে চলছে। যেমন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও ভুমণ্ডল প্রচলিত সাধারণ নিয়মের অধীনে চলছে। এই নিয়ম নীতি থেকে একচুল পরিমাণ নড়াচড়া করা এবং তা থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। এমনকি স্বয়ং মানুষ যদি তার নিজের বিষয় নিয়ে ভাবে, তাহলে তার কাছে স্পষ্ট হবে যে, সে আল্লাহর নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুগত। তাই সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী নিঃশ্বাস গ্রহণ করে এবং পানি, খাদ্য, আলো ও বাতাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী চলছে। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই অঙ্গগুলো কাজ করে থাকে। ফলে আল্লাহর এই ব্যাপক নির্ধারণ বা নিরূপণ যার কাছে

আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এই বিশ্বজগতের কোন কিছুই তার আনুগত্য হতে বের হতে পারবে না। আকাশের সব চেয়ে বড় নক্ষত্র হতে যমীনের ক্ষুদ্র বালুকণা পর্যন্ত ক্ষমতাবান মহান আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে। সুতরাং আকাশ, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝের সব কিছু যখন এই নিয়ম মেনে চলছে, তখন বলতে পারি পুরো পৃথিবীই এই মহান শক্তিধর মালিকের আনুগত্য করছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিশ্চায়ই ইসলামই বিশ্বজগতের উপযুক্ত ধর্ম। কারণ ইসলাম অর্থ হল; কোন ওযর আপত্তি ছাড়াই নির্দেশদাতার নির্দেশ মান্য ও আনুগত্য করা এবং নিষেধাজ্ঞা হতে বিরত থাকা, যেমন কিছু আগেই আপনি জানতে পেরেছেন। সুতরাং সূর্য, চন্দ্র, যমীন, বাতাস, পানি, আলো, অন্ধকার, উত্তাপ, গাছপালা, পাথর, জীব-জন্তু সবই অনুগত। বরং এমন মানুষ যে তার প্রতিপালককে চেনে না,তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে,তাঁর নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং তাঁর সঙ্গে অন্যকে অংশীদার করে, সে ব্যক্তিও ফিতরাতের দিক থেকে অনুগত, যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর সব কিছু যখন অনুগত হয়ে চলছে তখন আসুন আমরা মানুষের ব্যাপারটি নিয়ে ভেবে দেখি, তাহলে দেখতে পাব দুটি বিষয় মানুষের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেঃ

প্রতমতঃ মহান আল্লাহ যে ফিতরাত দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর ইবাদত ও নৈকট্য অর্জনকে ভালবাসা। আল্লাহ যে হক, কল্যাণ ও সত্যকে ভালবাসেন তা ভালবাসা এবং তিনি যে অসত্য, অমূলক, অন্যায় অত্যাচার অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা। এগুলো ছাড়াও ফিতরাতের আরো অনেক চাহিদা আছে, যেমন; সম্পদ, পরিবার, সন্তান সন্ততির মোহ, খাদ্য-পানীয় ও বিবাহের প্রতি দুর্বলতা এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে চাহিদার প্রয়োজন অনুভব করে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা। আল্লাহ তা'য়ালা তার নিকট বহু সংখ্যক নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন, আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে সে সত্য ও অসত্য, হেদায়েত ও ভ্রষ্টতা এবং কল্যাণ ও

অকল্যানের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তারপর বিবেক ও বুঝ শক্তি দিয়ে তাকে শক্তিশালী করেছেন, যাতে করে কোন কিছু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। সুতরাং যদি সে কল্যাণের পথে চলতে ইচ্ছা করে, তবে তা তাকে ন্যায় ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করবে। আর যদি অকল্যাণের পথের পথিক হতে চায়, তবে তা তাকে অনিষ্ট ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব আপনি যদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তাহলে আপনি তাকে আত্মসমর্পণের উপর উন্মুক্ত এবং তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জন্মগত স্বভাববিশিষ্ট হিসেবে পাবেন। আসলে এক্ষেত্রে তার অবস্থা অন্যান্য সৃষ্টিকূলের মতই। আর যদি দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তাহলে আপনি তাকে স্বাধীন ইচ্ছার অধীকারী হিসেবে পাবেন। সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন কিছু নির্বাচন করতে পারে। চাইলে মুসলিম অথবা কাফির হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (الانسان : ٣)

অর্থাৎঃ হয় সে কৃতজ্ঞ হবে নয়তো অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা দাহর ৭৬ ঃ ৩)

মূলত এ কারণেই আপনি এই পৃথিবীতে দু'রকম মানুষ পাবেন: এদের এক প্রকার মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানে, তাঁকে প্রতিপালক, শাসনকর্তা মা'বূদ মেনে তাঁর প্রতি ঈমান আনে। ঐচ্ছিক জীবনে সে তাঁর বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে চলে, যেমনিভাবে তার প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখান থেকে পিছনে ফেরার বিকল্প কোন পথ নেই এবং সে ভাগ্যের অনুসরণ করে থাকে। এই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত মুসলিম, যে তার ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছে এবং তার জানা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে জানতে পেরেছে, যিনি তার নিকট অসংখ্য নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাকে বিদ্যা অর্জনের শক্তি দান করেছেন। এ ধরণের ব্যক্তির বিবেক ও বিবেচনা শক্তি বিশুদ্ধ; কেননা সে তার চিন্তা-চেতনার সঠিক মুল্যায়ন করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না; যিনি সকল বিষয়ে বুঝ ও বিবেচনাশক্তি দান করে তাকে সম্মানিত করেছেন। আর তার জিহ্বা শুধু সঠিক ও সত্য কথা বলতে

শেখে; কেননা, সে আল্লাহকেই প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যিনি তাকে কথা বলার শক্তি দিয়ে ধন্য করেছেন। আসলে এমতাবস্থায় তার পুরো জীবন শুধু সত্যের উপর বিচরণ করে; কারণ সে আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে অনুগত, যার মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত আছে। আর তার মাঝে এবং পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টিকূলের মাঝে পারস্পরিক পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার বন্ধন সম্প্রসারিত হয়; কেননা সে মহা জ্ঞানী, ক্ষমতাবান আল্লাহর দাসত্ব করেঃ যার দাসত্ব, নির্দেশ এবং ভাগ্যের অনুগত হয়ে চলছে সমস্ত সৃষ্টজীব। আর হে মানুষ! এগুলোকে তো আপনার কল্যাণের জন্যই অনুগত করে সৃষ্টি করেছেন।

কুফরের প্রকৃত অবস্থা

অপরদিকে আর এক ধরণের মানুষ আছে, যারা আত্মসমর্পণকারী রূপে জন্মগ্রহণ করে আজীবন আত্মসমর্পণ করত জীবন অতিবাহিত করে; কিন্তু সে নিজের আত্মসমর্পণবোধকে অনুধাবন করতে পারে না। যার ফলে সে তার রবকে চিনতে পারে না, তাঁর শরীয়তের উপর ঈমান আনে না, তাঁর রসূলগণের অনুসরণ করে না, মহান আল্লাহ যে তাকে জ্ঞান ও বিবেক শক্তি দান করেছেন এবং তাকে শ্রবণ ও দর্শণ শক্তি দান করেছেন তার সৃষ্টিকর্তাকে চেনার জন্য, সেটাও সে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে না। বরং সে তার প্রতিপালকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং তার সার্বিক জীবনের যে বিষয়ে তাকে পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সে আল্লাহর শরীয়ত পালনকে অস্বীকার করে অথবা তার প্রভুর সাথে অন্যকে অংশীদার করে এবং তাঁর এককত্বের নিদর্শনকে মানতে অস্বীকার করে। এ ব্যক্তিই হলো প্রকৃত কাফের। কারণ কুফরের অর্থ হলঃ গোপন করা, ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা।

যেমন : كفر درعه بثوبه

কথাটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যে তার পরিহিত পোশাক দ্বারা তার বর্মকে ঢেকে রাখে। এই ধরণের লোককে কাফের বলার কারণ সে তার ফিতরাতকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। একটু

আগে জানতে পেরেছেন যে, সে ইসলামের ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করেছে। আর তার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ এই ফিতরাত অনুসারেই কাজ করে থাকে। তার আশে পাশে সব কিছু আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে চলছে। কিন্তু সে তার মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার গোপন পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এতে করে তার দৃষ্টিশক্তি থেকে তার ও দুনিয়ার ফিতরাতের কার্যকারিতা অদৃশ্য হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আপনি তাকে দেখবেন, সে তার চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি তার ফিতরাতের বিপক্ষে ব্যবহার করছে। এর বিপরীত দিকগুলোই শুধু সে দেখতে পায় এবং একে উচ্ছেদ করতে সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এখন আপনি আপনার বিবেকশক্তি দিয়ে চিন্তা করে দেখুন, একজন কাফের কতটা ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারে ডুবে আছে। (মাবাদিউল ইসলাম ঃ পৃঃ ৩ ও ৪)

ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে আপনি মেনে চলবেন এটাই ইসলামের দাবী। এটা খুব কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ যার জন্য সহজ করেছেন তার জন্য অতি সহজ। সমস্ত পৃথিবী ইসলামের দিক নির্দেশনা মেনে চলছে।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً (آل عمران: ٨٣)

অর্থাৎঃ আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৮৩)

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম সে কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন ঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ (آل عمران: ١٩)

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯)

ইসলাম হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মসমর্পণ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ (آل عمران: ٢٠)

অর্থাৎঃ আর যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে আপনি বলুনঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ২০)

নবী (ﷺ) ইসলামের পরিচয় বর্ণনা করে বলেনঃ

أن تسلم قلبك لله ، وأن تولي وجهك لله ، وتؤتي الزكاة المفروضة

অর্থাৎঃ ইসলাম হলো আপনি আপনার অন্তরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমর্পণ করবেন, আপনার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর জন্যই ফিরাবেন এবং যাকাত ফরয হলে আদায় করবেন। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ঃ ৫ম খণ্ড, ৩ নং পৃষ্ঠা এবং ইবনে হিব্বানঃ ১ম খণ্ড, ৩৭৭ নং পৃষ্ঠা)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) জিজ্ঞেস করেন, ইসলাম কী? উত্তরে তিনি বলেন ঃ

"أن يسلم قلبك لله ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك . قال : أيالإسلام أفضل ؟ قال : الإيمان . قال : وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت،

অর্থাৎঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার অন্তরকে সোপর্দ করা এবং আপনার জিহ্বা হাতের অনিষ্টতা হতে সকল মুসলমানের নিরাপত্তা লাভ করা। এরপর লোকটি জিজ্ঞেস করলঃ ইসলামের কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তখন তিনি বলেনঃ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। লোকটি বললঃ বিশ্বাস স্থাপন করা কী? তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'য়ালা, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (মুসনাদ ইমাম আহমাদঃ ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪ নং পৃষ্ঠা। ইমাম হাইসামি রচিত আল-মাজমা' ১ম খণ্ড, ৫৯ নং পৃষ্ঠা।)

ইমাম আহমাদ ও ইমাম তাবারানী আল জামেউল কাবীরে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (দেখুন, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহহাব রচিত "ফাজলুল ইসলাম" ঃ ৮ নং পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে তিনি এর পরিচয়ে অন্যত্র বলেন ঃ

« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا »

অর্থাৎঃ ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘর (কা'বার) হজ্জ পালন করা। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ঃ কিতাবুল ঈমান; হাদীস নং ৮)

তিনি আরো বলেনঃ

> المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده <

অর্থাৎঃ প্রকৃত মুসলমান তো সেই যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্টতা হতে সমগ্র মুসলমান নিরাপদ। (সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুল ঈমান, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমূনা মিল লিসানিহী ওয়া ইয়াদিহী" অধ্যায়; হাদীসের শব্দগুলো তার নিজস্ব এবং সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুল ঈমান; হাদীস নং.....)

আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারো নিকট হতে গ্রহণ করবেন না। কারণ সমস্ত নবী ও রাসূলগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মের উপর। আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (عليه السلام) সম্পর্কে বলেনঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ - فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (يونس:٧١ – ٧٢)

অর্থাৎঃ হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনি তাদেরকে নূহ (عليه السلام)-এর ইতিবৃত্ত পড়ে শোনান, যখন তিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে বললেনঃ হে আমার জাতি! আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলীর নসীহত করা যদি তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তবে আমরা তো আল্লাহরই উপর ভরসা করি। সুতরাং তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও, তারপর তোমাদের সেই তদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার

সাথে যা করতে চাও করে ফেলো, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন মুসলমানদের একজন হই। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৭১-৭২)

ইবরাহীম (عليه السلام) সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرة:١٣١)

অর্থাৎঃ যখন তার প্রভু তাকে বললেনঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর (মুসলমান হও) তখন সে বললঃ আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৩১)

মূসা (عليه السلام) সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (يونس:٨٤)

অর্থাৎঃ আর মূসা (عليه السلام) বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো, তবে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হয়ে থাকো। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৮৪)

এবং ঈসা (عليه السلام)-এর সংবাদ দিয়ে তিনি বলেনঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُون (المائدة:١١١)

অর্থাৎঃ আর যখন আমি হাওয়ারিদেরকে আদেশ করলাম– আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বললঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ১১১)

ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান, আক্বীদা-বিশ্বাস সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত ওহী অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ হতে গ্রহণ করা হয়। আমি এখন এ দু'টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোকপাত করব, ইনশা-আল্লাহ।

ইসলামের উৎসসমূহ

মানব রচিত ও রহিত হওয়া ধর্মগুলোর অনুসারীরা তাদের মাঝে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিতাবসমূকে পবিত্র করার একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছিল। সব কিতাব লেখা হয়েছিল প্রাচীন যুগে। ফলে এ সমস্ত কিতাব কে লেখেছে? বা কে তার অনুবাদ করেছে? বা কোন সময় লেখা হয়েছে, তার কোন সত্যতা জানা যায় না। বরং এগুলো এমন সব মানুষর লেখেছিল যাদের মাঝে ঐসব গুণ থাকে যা অন্য মানুষের মাঝেও থাকে। যথাঃ দুর্বলতা, ঘাটতি, প্রবৃত্তি, ভুল ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে অন্য ধর্ম হতে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ তা হক্ব বা সত্য মূলনীতির (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ব ওহীর) উপর নির্ভর করে। তথা "কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস)"। নিচে এ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল ঃ

(ক) মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন ঃ

ইতোপূর্বে আপনি জেনেছেন যে, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেন। যা মুত্তাক্বীন তথা পরহেজগার বান্দাদের জন্য হেদায়েত এবং মুসলমানদের জন্য সংবিধানস্বরূপ। আর আল্লাহ যাদের (কুফুরি ও নেফাকি) হতে আরোগ্য কামনা করেন কুরআন তাদের অন্তরের রোগমুক্তি এবং যাদের মুক্তি ও (হেদায়েতের) আলো কামনা করেন তাদের জন্য আলোকবর্তীকাস্বরূপ। মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন ঐ সমস্ত মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত, যে কারণে আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। (শায়খ মোস্তফা আস্ সুবায়ী প্রণীত "আস্ সুন্নাতু ওয়া মাকানতুহা ফিত্তাশরীঈল ইসলামী ঃ ৩৭৩ নং পৃষ্ঠ)

এটি আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে অভিনব কিতাব নয়, যেমন মুহাম্মাদ (ﷺ)ও কোন অভিনব রাসূল ছিলেন না। বরং এর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর উপর সহীফা অবতীর্ণ করেন। মূসা (عليه السلام)-কে তাওরাত ও দাউদ (عليه السلام)-কে যাবুর দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেন। এমনিভাবে ঈসা মাসীহ (عليه السلام) ইঞ্জিল নিয়ে আসেন। এ সমস্ত কিতাব ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী। যা তিনি তাঁর প্রেরীত নাবী ও রাসূলগণকে ওহী

করেছিলেন। এসব পূর্ববর্তী কিতাবের সংখ্যা অনেক। কিন্তু এর অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন এবং তিনি তাকে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের তত্ত্বাবধায়ক ও রহিতকারী করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ [المائدة : ٤٨]

অর্থাৎঃ আর আমি এ কিতাব (কুরআন)-কে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি হক্বের সাথে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐসব কিতাবের সংরক্ষকও। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৮)

আল্লাহ তা'য়ালা এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে, এতে প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ফলে মহিমান্বিত আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل : ٨٩]

অর্থাৎঃ আর আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যা প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৮৯)

আর তা হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ [الأنعام : ١٥٧]

অর্থাৎঃ আর তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং হেদায়েত ও রহমত সমাগত হয়েছে। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৫৭)

এটি যে পথ নির্দেশ করে তা হচ্ছে সব চেয়ে সঠিক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [الإسراء : ٩]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই এই কুরআন যে পথ নির্দেশ করে তা হচ্ছে সব চেয়ে সঠিক। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৯)

অতএব তা মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করে যেন তারা তাদের জীবনের সকল বিষয়ের পথকে সঠিকতর করে। আর যে চিন্তা ভাবনা করে যে, কিভাবে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে? তাহলে সে কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে এবং সে তার ইচ্ছাকেও আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ [الشعراء : ١٩٢ - ١٩٤]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই এটা (আল কুরআন) বিশ্বজাহানের প্রতিপালক হতে অবতারিত। রূহুল আমীন তথা জিবরাঈল (عليه السلام) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। (সূরা শুআ'রা ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪)

সুতরাং যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেন, তিনি হচ্ছেন বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ। আর যার মাধ্যমে তা অবতরণ হয়, তিনি রূহুল আমীন তথা জিবরাঈল (عليه السلام)। আর যার অন্তরে তা অবতরণ করা হয়, তিনি হচ্ছেন, নাবী (ﷺ)। এই কুরআন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যে সমস্ত নিদর্শন ক্বিয়ামত অবধি অবশিষ্ট থাকবে তার অন্তর্গত একটি স্থায়ী নিদর্শন। অথচ পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের নিদর্শন ও মু'জিযাসমূহও শেষ হয়ে যেত। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালা এই কুরআনকে একটি স্থায়ী নিদর্শন বা প্রমাণস্বরূপ করেছেন। এটা একটি পরিপূর্ণ প্রমাণ পত্র ও সমুজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন তারা যেন কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব, অথবা কুরআনের সূরার অনুরূপ দশটি সূরা, অথবা একটি সূরা নিয়ে আসে। কিন্তু তারা কয়েকটি অক্ষর বা শব্দ বানাতেও অপারগ হয়। অথচ যে জাতির উপর কুরআন অবতীর্ণ হয় তারা ছিল ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জাতী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [يونس : ٣٨]

অর্থাৎঃ তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নবীর) স্বরচিত? আপনি বলে দিনঃ তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস, আর যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে সক্ষম ডাক। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৩৮)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী তার প্রমাণ হলঃ এর মধ্যে পূর্ববর্তী জাতীর বহু সংবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সম্মুখে আগমনকারী যে সব ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা হুবহু ঐভাবেই ঘটেছে যেভাবে কুরআন সংবাদ দিয়েছে। আর অনেক বিষয়ে এমন সব বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উল্লেখ করেছে, বিজ্ঞানীরা যার কিছু মাত্র বিষয়ে বর্তমান যুগে এসে উপনীত হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী তার আরো প্রমাণ হলঃ যে নবীর উপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়, তাঁর কাছ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুরূপ কিছু জানা যায়নি এবং তার সদৃশ কোন বিষয়ও বর্ণনা করা হয়নি যা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [يونس : ١٦]

অর্থাৎঃ (হে রাসূল) আপনি বলে দিনঃ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো তবে

না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শুনাতাম, আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন, কেননা আমি এর পূর্বেওতো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহতি করেছি; তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ১৬)

বরং তিনি ছিলেন এমন নিরক্ষর ব্যক্তি যে, তিনি পড়তে ও লিখতে জানতেন না। এমনকি তিনি কোন শিক্ষকের নিকট গমন করেননি এবং কোন শিক্ষকের কাছে বসেননি। এতদসত্বেও তিনি বিশুদ্ধভাষী ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ কাফেরদেরকে কুরআনের অনুরূপ কিছু নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (العنكبوت: ٤٨)

অর্থাৎঃ আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখেননি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে। (সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ ৪৮)

এই নিরক্ষর নাবীর বৈশিষ্ট তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এমন নিরক্ষর, যিনি পড়তে ও লিখতে জানেন না। অথচ ইয়াহুদী ও নাসারাদের যেসব পাদ্রী বা পণ্ডিতদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কিছু অবশিষ্ট আছে, তারা যে ব্যাপারে মতভেদ করে সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে এবং তারা পরস্পর যে বিষয়ে ঝগড়া করে সে বিষয়ে তারা তাঁর নিকট বিচার প্রার্থনা করবে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সংবাদ পরিষ্কারভাবে বলেছেনঃ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف : ١٥٧]

অর্থাৎঃ যারা সেই নিরক্ষর রাসূল তথা নবী (ﷺ)-এর অনুসরণ করে, যাঁর কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত পায়, যিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর যিনি তাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেন --- (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৫৭)

মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে ইয়াহুদী ও নাসারারা যে প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তা'য়ালা তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে বলেনঃ

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ [النساء : ١٥٣]

অর্থাৎঃ আহলে কিতাবরা আপনার কাছে আবেদন করছে যে, আপনি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন কিতাব নাযিল করেন। (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৫৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ [الإسراء : ٨٥]

অর্থাৎঃ আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

মহিমান্বিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ [الكهف : ٨٣]

অর্থাৎঃ আর তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করে; (সূরা কাহ্‌ফ ১৮ ঃ ৮৩)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [النمل : ٧٦]

অর্থাৎঃ বানী ইসরাঈলেরা যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বর্ণনা করে। (সূরা নামল ১৬ ঃ ৭৬)

ইবরাহীম নামক এক খ্রীস্টান পাদরী ডিগ্রি অর্জনের জন্য তার ডক্টরেড থিসিসের মধ্যে কুরআনকে সন্দেহযুক্ত করার অপচেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। বরং কুরআন তার দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা তাঁকে পরাভূত করে। ফলে তিনি তার অক্ষমতার ঘোষণা দিয়ে, মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তিনি তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। (দেখুন ঃ ইব্রাহীম খলীল আহমাদ রচিত "আল-মুসতাশরিকুন ওয়াল মুবাশ্‌শিরূন ফিল আ'লামিল আরাবী ওয়াল ইসলামী গ্রন্থ)। এমনিভাবে একজন মুসলমান আমেরিকান নাগরিক ড. জাফরী লাং নামক এক ভদ্রলোককে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনুবাদের একখানা কপি দিলে সে তা পাঠ করে অনুভব করে যে, এই কুরআন যেন তাকেই সম্বোধন করে কথা বলছে। আর তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তার ও তার অন্তরের মাঝে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা অপসারণ করছে। বরং সে বলে ঃ নিশ্চয়ই যে স্বত্তা এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি যেন আমাকে আমি যতখানি জানি তার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। (ড. জাফরী লাং রচিত

"আসসেরাউ মিন আজলিল ঈমান" অনুবাদ ঃ ড. মুনযির আবসী, দারুল ফিক্‌র প্রকাশনা ঃ ৩৪ নং পৃষ্ঠা)

কেনই বা নয়? যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনিই তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন মহা পবিত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك : ١٤]

অর্থাৎঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি জানেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (সূরা মুল্‌ক ৬৭ ঃ ১৪)

সুতরাং কুরআনুল কারীমের অনুবাদ পড়াটাই ড. জাফরীর ইসলামের মধ্যে প্রবেশ এবং উক্ত গ্রন্থ লেখার কারণ, যে গ্রন্থ থেকে আপনাকে রেফারেন্স দিলাম।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে তা নিয়ম-পদ্ধতি, আক্বীদা বা বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম, পারস্পরিক সম্পর্ক বা লেনদেন এবং আদব-কায়দাসমূহের মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام : ٣٨]

অর্থাৎঃ আমি (এই) কিতাবে কোন বস্তুর কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি। (সূরা আনআ'ম ৬ ঃ ৩৮)

সুতরাং এর মধ্যে আল্লাহর এককত্বের আহ্বান, তাঁর নাম, সিফাত বা বৈশিষ্ট্য-গুণাবলী ও কর্মসমূহের বর্ণনা রয়েছে। তা নবী ও রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার দিকে আহ্বান করে। ক্বিয়ামত দিবস, কর্মের প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশকে সাব্যস্ত এবং এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ ও দুনিয়াতে তাদের প্রতি যে নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে সব শাস্তি ও দুর্ভোগ তাদের জন্য আখেরাতে অপেক্ষা করছে তা বর্ণনা করে। এর মধ্যে অনেক জিনিসের এমন নিদর্শন, যুক্তি ও দলিল-প্রমাণাদী রয়েছে, যে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, আর তা প্রত্যেক যুগের অনুকূলে হয়। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এর মধ্যে তাদের কাংক্ষিত বস্তু পায়।

এখন আমি আপনার জন্য শুধুমাত্র তিনটি উদাহরণ পেশ করব, যা আপনাকে এর কিছুটা প্রকাশ করে দেবে। উদাহরণগুলো নিম্নরূপঃ

(১) আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا [الفرقان : ٥٣]

অর্থাৎঃ আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি, মজাদার এবং অপরটি লবণাক্ত, বিস্বাদ; উভয়ের মধ্যে করেছেন এক অন্তরায়, এক শক্ত ব্যবধান। (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৫৩)

মহিমান্বিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

أو كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ [النور : ٤٠]

অর্থাৎঃ অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপর ঢেউ, যার উপর মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারময় স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না; আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্যে কোন আলো নেই। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৪০)

আর সর্বজন বিদিত যে মুহাম্মাদ (ﷺ) কখনও সমুদ্র গমন করেননি এবং সমুদ্রের গভীরতা অনুসন্ধানে সাহায্য করবে এ ধরনের কোন বস্তুগত মাধ্যমও তাঁর যুগে ছিল না। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত আর কে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে এ তথ্যাবলী জানিয়েছেন?

(২) আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ [المؤمنون : ١٢ - ١٤]

অর্থাৎঃ আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদামাটির মূল উপাদান (নির্যাস) হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশ্‌তপিণ্ডে এবং গোশ্‌তপিণ্ডকে পরিণত করি হাড়সমূহে; অতঃপর হাড়সমূহকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ১২-১৪)

বিজ্ঞানীরা বর্তমান যুগে এসেই কেবল গর্ভস্থ সন্তানের (ভ্রূণের) সৃষ্টির ধাপ সম্পর্কে এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উদ্ঘাটন করে।

(৩) আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [الأنعام : ٥٩]

অর্থাৎঃ গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠী তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভু-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না। এমনিভাবে যে কোন সিক্ত ও শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আনআম ৬ ঃ ৫৯)

মানবজাতি এই ব্যাপক চিন্তা পর্যন্ত বিবেচনা করতে পারে না এবং এ ব্যাপারে চিন্তাও করে না; অধিকন্তু তারা তা করতে সক্ষমও না। বরং বিজ্ঞানীদের কোন দল যদি একটি অঙ্কুর অথবা একটি কীট পতঙ্গ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার সম্পর্কে যা জানতে পেরেছে তা রেকর্ড করে, তাহলে সে কারণে আমরা খুবই বিস্ময় প্রকাশ করি। অথচ তারা যে ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করেছে তার চেয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রই তাদের কাছে গোপন রয়েছে। ফ্রান্সের অধিবাসী বিজ্ঞানী মোরিস বুকাইলী তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের মাঝে তুলনা করে এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে সাম্প্রতিক আবিষ্কার যেখানে পৌঁছেছে তা বর্ণনা করেন

। তাতে তিনি পেয়েছেন, সাম্প্রতিককালের আবিষ্কার মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তার হুবহু মিল রয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, মানুষ এবং জীবজন্তুর সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত দেখেছেন। (দেখুন ঃ মোরিস বুকাইল রচিত "আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন" ঃ ১৩৩-২৮৩ পৃষ্ঠা, তিনি ফ্রান্সের অধিবাসী ও খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী একজন ডাক্তার ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন)

(খ) নবী (ﷺ)-এর সুন্নাহ তথা হাদীস ঃ

আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেন এবং তার সদৃশ আরো কিছু ওহী করেন; তা-ই হল ঃ সুন্নাতে নববী (ﷺ) অর্থাৎ; হাদীস। যা কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও ভিত্তি। নাবী (ﷺ) বলেনঃ জেনে রেখো! আমাকে কুরআন ও তার সাথে তার সদৃশ কিছু দেয়া হয়েছে। (মুসনাদ আহমাদ ঃ ৪ র্থ খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা। সুনান আবূ দাউদঃ কিতাবুস সুন্নাহ; সুন্নাহর অপরিহার্যতা পরিচ্ছেদ, হাদীস নংঃ ৪৬০৪, ৪র্থ খণ্ড, ২০০ নং পৃষ্ঠা)

নবী (ﷺ)-কে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন কুরআনের মধ্যে যা রয়েছে তা বর্ণনা করেন। যেমনঃ (إجمالي) অথবা সংক্ষিপ্ত (خصوص)অথবা বিশেষ (عموم) ব্যাপক ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل : ٤٤]

অর্থাৎঃ আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৪৪)

সুন্নাহ বা হাদীস হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস। আর তা প্রত্যেক যা সহীহ সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, যার সূত্র রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত ধারাবাহিক, হোক তা কথা, অথবা কাজ, অথবা সম্মতি, অথবা গুণ বা বৈশিষ্ট্য হোক না কেন। আর তা আল্লাহর পক্ষ হতে তার প্রেরিত রাসূল

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ওহী। কারণ নাবী (ﷺ) প্রবৃত্তি হতে কোন কথা বলেন না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

[النجم : ٣ - ٥]

অর্থাৎঃ আর তিনি প্রবৃত্তি হতে কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তো এক ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। তাকে শিক্ষা দান করে মহা শক্তিশালী (ফেরেশতা)। (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ৩ - ৫)

তাঁকে কেবল যা আদেশ করা হয়েছে তিনি মানুষের নিকট তা-ই প্রচার করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ [الأحقاف : ٩]

অর্থাৎঃ আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি তো শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই। (সূরা আহক্বাফ ৪৬ ঃ ৯)

পবিত্র সুন্নাহ হল ইসলামের বাস্তবিক ব্যবহার। যেমন এতে রয়েছেঃ বিধি-বিধান, আক্বীদা বা বিশ্বাস, ইবাদত, পারস্পরিক সম্পর্ক বা লেনদেন, আদব-কায়দা ইত্যাদি। নাবী (ﷺ)-কে যা হুকুম দেয়া হয় তা তিনি পালন করেন এবং মানুষের কাছে তা বর্ণনা করেন। আর তিনি যেভাবে করেন, ঠিক অনুরূপভাবে তাদেরকেও করার নির্দেশ দেন।

যেমন নাবী (ﷺ)-এর বাণী ঃ

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

অর্থাৎঃ তোমরা ঠিক ঐভাবে নামায পড়, যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ। (সহীহ বুখারী; আযান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ১৮)

আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদেরকে তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا [الأحزاب : ٢١]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহ্যাব ৩৩ ঃ ২১)

সম্মানিত সাহাবাবৃন্দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নবী (ﷺ)-এর বাণী ও কর্মসমূহকে তাঁদের পরবর্তীদের নিকট (অর্থাৎ তাবেয়ীদের নিকট) বর্ণনা করেন এবং তাঁরা তাঁদের পরবর্তীদের অর্থাৎ তাবে'-তাবেয়ীদের নিকট বর্ণনা করেন। অতঃপর সেগুলোর সঙ্কলন হাদীসের ভাণ্ডারে পরিণত হয়। আর হাদীস বর্ণনাকারী তার নিকট হতে যারা বর্ণনা করবেন তাদের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যারা তার নিকট হতে গ্রহণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে তারা তলব করেন যে, তিনি সে ব্যক্তির সমসাময়িক হবেন যে তার নিকট হতে গ্রহণ করেছে। যাতে করে সূত্রের ধারাবাহিকতা বর্ণনাকারী থেকে রাসূলুলাহ (ﷺ) পর্যন্ত সংযুক্ত হয়। (ফলে নাবী (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এই অনন্য ইলমী পদ্ধতি এবং এই নিয়ন্ত্রণের কারণে, মুসলমানদের মাঝে 'ইলমুল জারহি ওয়াত্ তা'দীল" এবং "মুসত্বলাহুল হাদীস" নামে এক প্রসিদ্ধ বিদ্যার সৃষ্টি হয়, এই দুটি বিদ্যা ইসলামী উম্মাহর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা পূর্বে আর কোন দিন ছিল না।)। আর বর্ণনা সূত্রের সকল বর্ণনাকারী যেন নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত হয়। সুন্নাহ যেমন ইসলামের বাস্তবিক ব্যবহার, তেমনি তা কুরআনুল কারীমকে প্রকাশ করে এবং এর আয়াতের ব্যাখ্যা করে ও সংক্ষিপ্ত হুকুম-আহকামগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। যেহেতু নাবী (ﷺ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তিনি কখনও কথার মাধ্যমে, কখনও কর্মের মাধ্যমে, আবার কখনও এতদুভয়ের মাধ্যমে একসাথে ব্যাখ্যা করতেন। আবার হাদীস কতিপয় বিধান ও আইন প্রণয়ন বর্ণনা করার দিক দিয়ে কুরআনুল কারীম হতে স্বাধীন। কুরআন ও

হাদীসের প্রতি এই বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যে, এ দুটি দ্বীন ইসলামের মূল দুটি উৎস। এ দুটির অনুসরণ করা, যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যার আদেশ মান্য করা ও নিষেধকে বর্জন করা, যার সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করা, এদুটির মধ্যে যে সব আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর কর্মসমূহ রয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ওলী-আওলিয়া মুমিনদের জন্য যা প্রস্তুত করেছেন ও তাঁর শত্রু কাফেরদের জন্য যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء : ٦٥]

অর্থাৎঃ অতএব আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নেবে, অতঃপর আপনি যে বিচার করবেন তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে আর তা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে। (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৬৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر : ٧]

অর্থাৎঃ রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ৭)

দ্বীনের স্তরসমূহঃ

এই দ্বীন বা ধর্মের উৎসের পরিচয় প্রদানের পর আমাদের উচিত হবে এর স্তরসমূহ বর্ণনা করা। আর তা হচ্ছেঃ ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। সংক্ষিপ্তভাবে এই স্তর গুলোর আরকান বা স্তম্ভসমূহ আলোচনা করব।

প্রথম স্তরঃ ইসলাম[৮]

এর রোকন পাঁচটি। যথাঃ দুটি সাক্ষ্য দেয়া (কালেমায়ে শাহাদাত), নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রোযা রাখা ও হজ্ব করা।

প্রথমতঃ (কালেমায়ে শাহাদাত) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই" সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো ঃ আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনিই সত্য উপাস্য, তিনি ব্যতীত আর সব বাতিল বা অসত্য। (দ্বীনুল হক্ব ঃ ৩৮)

এর দাবী হচ্ছে যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীর একনিষ্ঠতাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য স্থির করা। আর তিনি ব্যতীত অন্য সকলের জন্য তা নাকচ করা। এ কালেমার সাক্ষ্যদাতা যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে দুটি বিষয় সাব্যস্ত না করবে ততক্ষণ সে লাভবান হতে পারবে না।

এক ঃ (اثبات)

দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, একীন বা সুনিশ্চিত, তাসদীক বা সত্যায়ন ও ভালবাসার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা।

দুই ঃ (نفي)

আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যাদের উপাসনা করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত

---

৮. এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন ঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ রচিত "কিতাবুত্ তাওহীদ" "আলউসূলুস্ সালাছাহ" ও আদাবুল মাশী ইলাস্ স্বালাত"। শাইখ আব্দুর রহমান ওমার রাহিমাহুল্লাহ রচিত "দ্বীনুল হক্ব"। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আলী আল্ আরফাজ রাহিমাহুল্লাহ রচিত "মা লা বুদ্দা মিন মা'রিফাতিহী আনিল ইসলাম"। শাইখ আব্দুল্লাহ বিন জারূল্লাহ বিন জারূল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ রচিত "আরকানুল ইসলাম" এবং শাইখ আব্দুল্লাহ আল জিবরীন রাহিমাহুল্লাহর সম্পাদনায় একদল জ্ঞান পিপাসুদের সমন্বয়ে রচিত "শারহু আরকানিল ইসলাম ওয়াল ঈমান" কিতাবসমূহ।

অন্যান্য যাদের উপাসনা করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করে না, তবে এই সাক্ষ্য তার কোনই উপকারে আসবে না। (কুররাতু উয়ুনিল মুওয়াহ্হিদীন ঃ ৬০)

মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল বা দূত এই সাক্ষ্যদানের অর্থ হলোঃ তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, যে বিষয়ে খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, যা থেকে নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা পরিহার করা এবং তাঁর ত্বরীকা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা। জেনে রাখবেন ও বিশ্বাস পোষণ করবেন যে, আক্বীদা বিষয়ে হোক, আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ইবাদত সম্পর্কিত হোক, বিচার ও আইন বিষয়ক হোক, আখলাক সম্পর্কিত হোক, অথবা সমাজ ও পরিবার গঠন বিষয়ে হোক অথবা হালাল ও হারাম সম্পর্কিত হোক না কেন, আপনি কোন বিষয়ই একমাত্র এই সম্মানিত রাসূল বা দূত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পদ্ধতি ব্যতীত গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল বা দূত, তার পক্ষ থেকে শরীয়ত প্রচারক।

সালাত বা নামাযঃ

নামায ইসলামের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ। বরং ইসলামের মেরুদণ্ড। বান্দা ও রবের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। আল্লাহর বান্দাগণ প্রত্যেক দিন তা পাঁচবার আদায় করে থাকে। এর মাধ্যমে সে তার ঈমানকে নবায়ন করে এবং স্বীয় আত্মাকে পাপের ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র করে, অন্যায়-পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। সুতরাং আল্লাহর বান্দা যখন ভোরে ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং তুচ্ছ পার্থিব দুনিয়ার কাজ কর্ম আরম্ভ করার পূর্বে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হয়, অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে তার প্রভুর বড়ত্ব ঘোষণা করে এবং তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি দেয় ও তাঁর নিকট সাহায্য ও হেদায়েত চায়। সিজদা, ক্বিয়াম ও রুকুকারীর অবস্থায় তার ও তার রবের মাঝে দাসত্ব ও আনুগত্যের যে অঙ্গীকার রয়েছে তা নবায়ন করে, প্রত্যেক দিন পাঁচবার তা আদায় করে, আর এই নামাজ আদায়ের জন্য তার নামাযের জায়গা, কাপড়, শরীর, অন্তর পবিত্র হওয়া আবশ্যক। মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে যদি সহজ হয়, তবে সে ঐ সমস্ত মুসলমানের সাথে

জামাআতের সাথে তা আদায় করবে, যারা সবাই আন্তরিকভাবে তাদের রবের অভিমুখী এবং যাদের চেহারা আল্লাহর ঘর কা'বা পানে ফিরানো। সুতরাং এইভাবে নামায আদায় করলে, নামাযকে তার পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম পন্থায় স্থাপন করা হবে, যেমনিভাবে আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহর ইবাদত করে। যে ব্যক্তি এই ইবাদতে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শামিল করল যেমনঃ মুখের কথা, দুই হাত, দুই পা ও মাথার কাজ কর্ম, তাদের অনুভূতি এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যকেই এই মহান ইবাদত থেকে তার অংশ (নেকী) পাবে। সুতরাং অনুভূতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাদের এ থেকে নেকীর ভাগ পাবে। অন্তরও তার নেকীর ভাগ পাবে। আর নামায যে সব বিষয়কে শামিল করেছে তা হলোঃ আল্লাহর গুণগান, প্রশংসা, মহিমা, তাসবীহ, তাকবীর, সত্যের সাক্ষ্য, কুরআন তেলাওয়াত, মহা পরিচালক আল্লাহর সামনে অনুগত ও বিনয়ী বান্দার ন্যায় দাঁড়ানো, তারপর এই স্থানে তাঁর উদ্দেশ্যে হীন ও বিনয়ী হওয়া, তাঁর নৈকট্য অর্জন করা, আবার রুকু, সিজদা, বিনয়-নম্রতার সাথে বসা ইত্যাদি। তাঁর বড়ত্বের কাছে নতী স্বীকার ও তাঁর মর্যাদার কাছে নতী স্বীকার করার কারণে কখনও কখনও বান্দার অন্তর ভেঙ্গে পড়ে, তার শরীর তাঁর জন্য নীচ হয়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বিনয়ী হয়। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর নাবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ, এরপর তার প্রভুর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে সে তার নামায সমাপ্ত করে। (দেখুনঃ মিফতাহু দারস্স সাআদাহ ২য় খণ্ড ৩৮৪ পৃঃ)

যাকাতঃ[৯]

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ। ধনী মুসলমান ব্যক্তির উপর তার মালের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এটা খুব সহজ একটি বিষয়। অতঃপর ফকীর, মিসকীন ও অন্যান্য যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয তাদেরকে প্রদান করবে। যাকাতের যারা হক্বদার তাদেরকে খুশি

৯. বিস্তারিত দেখুন ঃ শাইখ বিন বায রাহেমাহুল্লাহ প্রণীত "রিসালাতানে মূ'জিযাতানে ফীয্ যাকাতি ওয়াস সিয়াম" নামক কিতাব।

মনে যাকাত প্রদান করা মুসলিম ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। এর মাধ্যমে সে তার হকদারদের খোঁটা দেবে না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেবে না। অনুরূপ ওয়াজিব হলো, মুসলমান ব্যক্তি এটা প্রদান করবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এর মাধ্যমে কোন সৃষ্টিজীবের নিকট থেকে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছা করবে না। বরং তা প্রদান করবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, যাতে সুখ্যাতি অর্জন ও প্রদর্শনের কোন চিহ্ন থাকবেনা।

যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য ঃ এর উদ্দেশ্য মালের বরকত লাভ। ফকীর, মিসকীন, ও অভাবীদের আত্মপ্রশান্তি এবং ভিক্ষার লাঞ্ছণা থেকে তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করা। আর ধনীরা যদি তাদেরকে পরিত্যাগ করে তবে তারা ক্ষতি ও অভাবের মধ্যে পড়ে যাবে, এ থেকে তাদের প্রতি দয়া করা। যাকাত প্রদানের আরো উপকারিতা হলোঃ এর মাধ্যমে বদান্যতা, দানশীলতা, স্বার্থত্যাগ, ব্যয় ও অনুগ্রহ ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় এবং কৃপণ, লোভী ও নীচ ইত্যাদি জাতীয় দুষণীয় চরিত্র থেকে বাঁচা যায়। এর মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে সম্পর্ক জোরদার হয়। ধনীরা তাদের গরীবদের অনুগ্রহ করে। সুতরাং, যদি এই পর্বটি বাস্তবায়ন করা হয়, তবে সমাজের মাঝে কোন প্রকার নিঃস্ব ফকীর, নূয়ে পড়া ঋণগ্রস্ত এবং সম্বলহারা বিপদগ্রস্থ মুসাফির রাস্তায় আটকা পড়ে থাকবে না।

সিয়াম বা রোযাঃ[১০]

অর্থাৎ রমযান মাসের রোযা, যা ফজর উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে রোযাদার পানাহার, স্ত্রী সহবাস, ও এতদুভয়ের হুকুমে যা পড়ে তা আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত পালণার্থে বর্জন করে এবং স্বীয় আত্মাকে তার কুপ্রবৃত্তির আমল থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ তা'য়ালা সিয়াম বা রোযাকে অসুস্থ, মুসাফির, গর্ভবতী, স্তন্যদানকারিণী, ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর উপর হালকা করে দিয়েছেন। ফলে তাদের প্রত্যেকের জন্য ঐ হুকুমই প্রযোজ্য হবে যা তাদের জন্য সঙ্গত হবে। এই

১০. বিস্তারিত দেখুনঃ শাইখ বিন বায রাহেমাহুল্লাহ প্রণীত" রিসালাতানে মূজিযকানে ফীয্ যাকাতি ওয়াস সিয়াম" নামক কিতাব।

মাসে মুসলমান তার আত্মাকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখে, যার ফলে এই মহান ইবাদত পালনের মাধ্যমে তার আত্মাকে পশুর সাদৃশ্য থেকে বের করে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের সাদৃশ্যের দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে রোযাদার এমন এক চিত্রের কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকে যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ব্যতীত পৃথিবীতে তার আর কোন প্রয়োজন নেই।

রোযা অন্তরকে পুনর্জীবিত করে। আর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত সৃষ্টি ও আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা পাওয়ার উৎসাহ দেয়। ধনীদেরকে ফকীর-মিসকীন এবং তাদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে তাদের অন্তর তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। তারা আল্লাহর যে সব নেয়ামত ভোগ করছে তা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রোযা আত্মাকে পবিত্র করে এবং তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ সকলে এই ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে যে, সুখে-দুঃখে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাদের উপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেহেতু সমাজের সকলে পূর্ণ একমাস এই ইবাদতের হেফাজতকারী ও স্বীয় প্রভুর অনুগত হয়ে অতিবাহিত করে। এ সব কিছু তাকে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে যে, আল্লাহ তা'য়ালা গোপন বিষয় ও যা লুকিয়ে রাখা হয় সব কিছু জানেন। আর মানুষকে একদিন তার প্রভুর সামনে অবশ্য অবশ্যই দণ্ডায়মান হতে হবে এবং তিনি তাকে তার ছোট-বড় সকল কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। (মিফতাহু দারুস সাআদাহ ২য় খণ্ড ৩৮৪ পৃঃ)

হজ্বঃ[১১] পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত বায়তুল্লাহিল হারাম (আল্লাহর সম্মানিত ঘর) কা'বার হজ্বব্রত পালন। যারা কা'বা ঘর পর্যন্ত পরিবহনের ব্যবস্থা, অথবা তার পারিশ্রমিক প্রদান এবং সেখানে যাওয়া

১১. বিস্তারিত দেখুন ঃ সম্মিলিত ওলামা বৃন্দের সমন্বয়ে রচিত "দালীলুল হাজ্ব ওয়াল মু'তামির" এবং আল্লামা শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ রচিত "আত্-তাহক্বীক্ব ওয়াল ইযাহ লি-কাসীরিম মিন মাসায়িলিল হাজ্বে ওয়াল ওমরাহ" গ্রন্থদ্বয়।

আসার সময় তার সার্বিক প্রয়োজন মেটাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা দরকার তার সামর্থ রাখে, ঐ সমস্ত প্রত্যেক ক্ষমতাবান, জ্ঞানবান, বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান ব্যক্তির উপর তা ফরজ।

তবে শর্ত হলো যে ঃ ব্যয়ের এই অর্থ তার ভরণ পোষণের দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের খাদ্য-খোরাক হতে অতিরিক্ত হতে হবে এবং সে যেন পথে তার জীবনের ব্যাপারে ও তার অনুপস্থিতিতে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হয়। যাদের সে পর্যন্ত (কা'বা ঘর) যাওয়ার সামর্থ রয়েছে তাদের উপর জীবনে মাত্র একবারই হজ্ব ফরজ। পাপের কালিমা হতে আত্মাকে পবিত্র করার নিমিত্তে হজ্বের ইচ্ছা পোষণকারীকে আল্লাহর নিকট তাওবা করা উচিত। এরপর সে যখন মক্কা মুকাররমা এবং হজ্বের পবিত্র স্থানসমূহে পৌঁছবে তখন আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত ও তাঁর সম্মানার্থে হজ্বের কার্যাদি সম্পন্ন করবে। আর জেনে রাখবেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কা'বা ও মাশায়ির অর্থাৎ হজ্বের অন্যান্য পবিত্র জায়গাসমূহ উপাস্য নয়, ফলে ওগুলোর ইবাদত করা যাবে না। বরং ওগুলো কারো উপকার বা অপকার কোন কিছুই করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা যদি ঐ সমস্ত জায়গাগুলোতে হজ্বের কার্য সম্পাদন করার নির্দেশ না দিতেন, তাহলে সেখানে গিয়ে মুসলমানের জন্য হজ্ব করা বৈধ হত না। হজ্বে এসে হজ্বপালনকারী ব্যক্তি একটি সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর পরিধান করে। অতঃপর সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলমানেরা একই স্থানে সমবেত হয়ে, একই ধরণের কাপড় পরিধান করে, একই রবের ইবাদত করেন। যেখানে শাসক ও শাসিত, নেতা ও অধীনস্থ, ধনী ও গরীব এবং সাদা ও কালোর মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলেই আল্লাহর সৃষ্টিজীব ও তাঁর বান্দা। আর এ কারণেই একমাত্র তাক্বওয়া অর্জন বা আল্লাহভীতি ও সৎ আমল ব্যতীত একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের উপর কোনই প্রাধান্য নেই। ফলে একত্রিত হয়ে হজ্ব পালনের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিচিতির পথ প্রসারিত হয়। এর মাধ্যমে তারা সকলেই ঐ দিনকে স্মরণ করেন, যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে পুনরুত্থিত করবেন এবং হিসাব-নিকাশের জন্য সবাইকে একই স্থানে একত্রিত করবেন। যার কারণে তারা আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। (প্রাগুক্ত ঃ ২য় খণ্ড ৩৮৫ নং পৃঃ এবং দ্বীনুল হাক্ব ঃ ৬৮ নং পৃ ঃ)

ইসলামে ইবাদতের সংজ্ঞা[১২]

অর্থগত ও প্রকৃতভাবে ইবাদত হলো আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব বা আনুগত্য করা। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর আপনি সৃষ্ট। আল্লাহ আপনার উপাস্য আর আপনি তাঁর বান্দা বা দাস। অবস্থা যদি এমনই হয়, তাহলে এই পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'য়ালার শরীয়তের অনুসারী হয়ে এবং তাঁর রাসূলের পদাঙ্ক অনুকরণের মাধ্যমে, তাঁর সোজা সরল পথের উপর মানুষের দৃঢ়ভাবে চলা উচিত। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য অনেক প্রকার মহান ইবাদত প্রবর্তন করেছেন। যেমন ঃ সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার জন্যেই তাওহীদ তথা এককত্বের বাস্তবায়ন, নামায সুপ্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, রোযা পালন এবং হজ্ব করা ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামে শুধুমাত্র এগুলোই সব ইবাদত নয়। বরং ইবাদত হচ্ছে একটি ব্যাপক বিষয়, ফলে তা হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ঐ সব প্রকাশ্য ও গোপন কথা এবং কাজ যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন। সুতরাং আপনার প্রতিটি কথা ও কাজ যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যার প্রতি সন্তুষ্ট হন তা-ই ইবাদত। বরং প্রত্যেক ভাল স্বভাব যা আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জনের নিয়তে করেন সেগুলোই ইবাদত। ফলে আপনি, আপনার পিতামাতা, পরিবারবর্গ, স্ত্রী, সন্তানাদি এবং প্রতিবেশীর সাথে যে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, এর দ্বারা যদি আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন তবে তাই ইবাদত। এমনিভাবে আমানতদারীতা, সত্যবাদীতা, ন্যায়বিচার বা ইনসাফ, কষ্ট না দেয়া, দুর্বলকে সাহায্য করা, হালাল উপার্জন, পরিবার ও সন্তানাদির উপর ব্যায় করা, মিসকীনকে সহযোগিতা করা, রুগী পরিদর্শন করা, ক্ষুধার্তকে আহার দেয়া, মাজলুমকে সাহায্য করা, এগুলো সবই ইবাদত; যদি এগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন। অতএব প্রতিটি কাজ, যা আপনি আপনার নিজের জন্যে, অথবা আপনার পরিবারের জন্যে, অথবা আপনার সমাজের জন্যে, অথবা আপনার দেশের জন্যে করেন, যদি এর দ্বারা আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন তবে তা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। এমনকি আল্লাহ তা'য়ালা আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, সেই সীমারেখার মধ্যে আপনার মনের

১২. দেখুনঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ রচিত কিতাব "আল্-উবূদীয়্যাহ"।

আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করাটাও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে, যদি তার সাথে সৎ নিয়ত সংযুক্ত করেন। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের কারো স্ত্রী সহবাসেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে হয় যে, আমরা যৌন তৃপ্তি অর্জন করবো আর তাতে সাওয়াবও রয়েছে? রাসূল (ﷺ)-এরশাদ করেন ঃ তোমরা বল তো দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তা হলে তার কি গুনাহ হবে না? অতএব সে যদি তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তা হলে অবশ্যই সাওয়াব হবে। (মুসলিমঃ যাকাত পর্ব; হাদীস নং ১০০৬)।

নাবী (ﷺ) আরো বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানকেই নিজ পক্ষ থেকে সাদকা দিতে হবে। তখন সাহাবাগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর নাবী! যদি কেউ সাদকা দেয়ার মত কিছু না পায়? নাবী (ﷺ) বললেনঃ সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদকা দিবে। সাহাবাগণ বললেনঃ যদি সে তা করতে না পারে? নাবী (ﷺ) বললেনঃ তখন সে একজন দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে সহযোগিতা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কেউ আবার নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ যদি সে তা করতে না পারে? নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তখন সে সৎ বা ভাল কাজের আদেশ দিবে। সাহাবাগণ বললেন ঃ যদি সে তা করতে না পারে? নাবী (ﷺ) বললেন ঃ তখন সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে, ফলে সেটাই তার জন্য সাদকা হবে। (বুখারী ঃ যাকাত পর্ব; ২৯ নং অধ্যায়, মুসলিমঃ যাকাত পর্ব; হাদীস নং ১১০৮, হাদীসের শব্দগুলো বুখারী শরীফের)

দ্বিতীয় স্তর ঃ ঈমানঃ[১৩]

ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি, যথা ঃ

আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূল বা দূতগণ, শেষ দিবস ও তাক্বদীর বা ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

১৩. বিস্তারিত দেখুনঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'শারহু উসূলিল ঈমান ও আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ" এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ রচিত "কিতাবুল ঈমান"।

প্রথম ঃ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের (প্রভুত্বের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জিনিসের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও পরিচালক এবং তাঁর উলুহিয়্যাতের (ইবাদতের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তিনিই সত্য উপাস্য, তিনি ব্যতীত আর সব উপাস্য বাতিল বা অসত্য এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং পরিপূর্ণ ও সুউচ্চ গুণাবলী রয়েছে। আর এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব), উলুহিয়্যাত (ইবাদত) এবং নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নাই। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

{رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم: ٦٥]

অর্থাৎঃ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবারই প্রতিপালক। সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত থাকো; তুমি কি তাঁর সমতুল্য আর কাউকে জান? (সূরা মারইয়াম ১৯ ঃ ৬৫)

আরো বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তাঁকে তন্দ্রা ও ঘুম স্পর্শ করে না,

তিনি প্রকাশ্য ও অদৃশ্যের সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি হচ্ছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [الأنعام : ٥٩]

অর্থাৎঃ গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও

ঝরে না এবং ভু-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না। এমনিভাবে যে কোন সিক্ত ও শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আনআম ৬ ঃ ৫৯)

আরো বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলের সুউচ্চে আরশের উপরে রয়েছেন। তবে তিনি তাঁর সৃষ্টিজীবের সাথে রয়েছেন এভাবে যে, তিনি তাদের সর্বাবস্থা অবগত রয়েছেন, তাদের সব ধরনের কথাবার্তা শ্রবণ করেন, তাদের অবস্থানসমূহ দেখেন, তাদের যাবতীয় কর্মসমূহ পরিচালনা করেন, দরিদ্রকে আহার দেন, ব্যর্থকে আশ্রয় দেন, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। (দেখুনঃ আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ ৭, ১১ নং পৃঃ)

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কতিপয় ফলাফল ঃ

(১) আল্লাহর ভালবাসা ও সম্মান এমন বান্দার উপকারে আসবে যারা তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে সাড়াদানকারী। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এগুলো পালন করে, তবে সে এর কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ সৌভাগ্য ও কল্যাণ অর্জন করবে।

(২) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অন্তরে সম্মান ও গৌরব সৃষ্টি করে। কারণ সে জানে যে, এই বিশ্বজাহানে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোন উপকারকারী ও অপকারকারী নেই।

এই জ্ঞান তাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের হতে অমুখাপেক্ষী করবে এবং তিনি ছাড়া অন্যের ভয়কে তার অন্তর হতে দূর করবে। ফলে সে তখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট আশা করবে না এবং তিনি ছাড়া আর কাউকে ভয়ও করবে না।

(৩) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তার অন্তরে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করবে। কারণ সে জানে যে, সে যেসব নিয়া'মত ভোগ করছে তার সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং শয়তান তাকে ধোঁকায় ফেলতে পারে না, তাই সে অহঙ্কার ও গর্ব করে না এবং সে তার শক্তি ও অর্থের বড়াইও করে না।

(৪) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এটা দৃঢ়ভাবে অবগত রয়েছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা রাজী ও খুশি হন এমন সৎ আমল ছাড়া সাফল্য ও মুক্তি অর্জনের আর কোন পথ নেই। অথচ অন্যরা বিভিন্ন ধরণের বাতিল বিশ্বাস পোষণ করে। যেমন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অপরাধ মার্জনা করার জন্য তার ছেলেকে শূলের আদেশ দেন (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। অথবা আল্লাহ ছাড়া এমন উপাস্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এই মত পোষণ করে যে, সে তার চাহিদা পূরণ করে দেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কোনই উপকার ও অপকার করবেনা। অথবা নাস্তিক (অবিশ্বাসী) হবে, সুতরাং সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করবে না। এগুলো সবই হলো ভ্রান্তদের ধারণা মাত্র। অবশেষে যখন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে এবং প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে, তখন বুঝতে পারবে যে, তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

(৫) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস মানুষের অন্তরে সিদ্ধান্ত, সাহসিকতা, ধৈর্য, অবিচলতা, ও তাওয়াক্কুলের মহান শক্তি তখনই বৃদ্ধি করবে, যখন সে দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এসব মহান কাজের দায়িত্ব পালন করবে এবং তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে যে, সে আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিকের উপর নির্ভরশীল। তিনিই তাকে সাহায্য করবেন ও তার হাতকে শক্তিশালী করবেন। সুতরাং সে তার ধৈর্য, অবিচলতা ও তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে শক্ত পাহাড়ের মত মজবুত হবে। (দেখুন ঃ আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ; ৪৪ নং পৃঃ এবং মাবাদিউল ইসলাম ঃ ৮০, ৮৪ নং পৃঃ)।

দ্বিতীয়ঃ ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসঃ

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আনুগত্য করার জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে, তারা হচ্ছেঃ

عِبَادٌ مُكْرَمُونَ - لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (الأنبياء :٢٦-٢٨)

অর্থাৎঃ তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তাঁরা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত; তারা (ফেরেশতাগণ) সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২৬-২৮)

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সম্পর্কে আরো বলেনঃ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ - يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ [الأنبياء : ١٩، ٢٠]

অর্থাৎঃ তারা অহঙ্কার বশে তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তি বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য (ক্লান্তিবোধ) করে না। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ১৯ - ২০)

আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে আমাদের দর্শন থেকে আড়াল করে রেখেছেন। যার ফলে আমরা তাদেরকে দেখতে পায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা কখনও কখনও আবার কিছু নাবী ও রাসূলদের জন্য তাদের কাউকে (স্ব-আকৃতিতে) প্রকাশ করেছেন। ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন প্রকার কর্মের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন ওহী অবতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত জিব্রাঈল (عليه السلام)। সে আল্লাহর নিকট হতে ওহী নিয়ে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে রাসূল নিযুক্ত করেছেন তার নিকট অবতরণ করেন। কেউ সমস্ত জান কবজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিছু ফেরেশতা মাতৃগর্ভের সন্তান বা ভ্রূণের কাজে নিয়োজিত। কেউ আদম সন্তানের হিফাজতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার কেউ তাদের সকল প্রকার কর্ম লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির দু'কাঁধে দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق : ١٧، ١٨]

অর্থাৎঃ তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (সূরা ক্বাফ ৫০ ঃ ১৭ ও ১৮ নং আয়াত। বিস্তারিত দেখুন ঃ আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ ঃ ১৯)

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কিছু উপকারিতা ঃ

(১) শিরক ও তার কলঙ্কের কালিমা হতে মুসলমানের আক্বীদা বা বিশ্বাস পবিত্র হয়। কারণ মুসলমান যদি ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তবে সে এ বিশ্বাস থেকে বেঁচে যাবে যে, এমন কিছু কাল্পনিক (ওলী-আউলিয়া) সৃষ্টিজীব বিদ্যমান রয়েছে যারা এই বিশ্ব পরিচালনায় (আল্লাহর) অংশীদার।

(২) মুসলমান এটা জানবে যে, ফেরেশতারা উপকারও করে না, অপকারও করে না। বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তাঁরা তা অমান্য করেন না এবং তাদেরকে যা করার আদেশ দেয়া হয় তারা তাই করেন। সুতরাং তাদের ইবাদত করা যাবে না, তাদের অভিমুখি (বিপদে-আপদে) হওয়া যাবে না, তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না।

তৃতীয়ঃ আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখাঃ

তা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সত্যতা বর্ণনা করার জন্যে ও তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বানের জন্যে স্বীয় নবী ও রাসূলগণের প্রতি অসংখ্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [الحديد : ٢٥]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ ৫৯ ঃ ২৫)

এ সমস্ত কিতাবের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর সহীফা, মূসা (عليه السلام)-কে দেয়া হয়েছিল তাওরাত, দাউদ (عليه السلام)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল যাবুর এবং ঈসা (عليه السلام)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল ইঞ্জিল। সুতরাং এসব পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলগণের প্রতি

ওগুলো অবতীর্ণ করেছেন আপনি তা বিশ্বাস করেছেন। আর শরীয়ত ওগুলোকে ঐসব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত করেছে যা আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার ইচ্ছা সেই সময়ে করেছিলেন। আর যে সমস্ত কিতাবের সংবাদ আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন তার সবই (কালের পরিবর্তনে) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর সহীফার কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই। পক্ষান্তরে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর ইত্যাদি, নামে মাত্র ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের নিকট পাওয়া গেলেও এগুলো বিকৃত ও পরিবর্তন করা হয়েছে, এর অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, এর মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করেছে যা আদৌ তাতে ছিল না, বরং তা এমন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত যার প্রকৃত অধিকারী সে নয়। যেমনঃ "আহদুল ক্বাদীম" (বাইবেলের পুরাতন টেস্টামেন্ট)-এর মধ্যে চল্লিশটিরও বেশী সিফ্‌র রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র পাঁচটি মূসা (عليه السلام) এ দিকে সম্বন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ যে কিতাব অবতীর্ণ হয়, তা হল ঃ মহাগ্রন্থ "আল কুরআন" যা তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যা আজও স্বয়ং আল্লাহর হিফাজতে সুসংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। (আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে) আজ পর্যন্ত এর একটি অক্ষর, বা একটি শব্দ, বা একটি হরকত অথবা এর অর্থের মাঝে কোন পরিবর্তন বা বিকৃত হয়নি।

আল্-কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মাঝে পার্থক্যের অনেক কারণ রয়েছে! এর কিছু নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

(১) পূর্ববর্তী এই কিতাবসমূহ মূলত বিলীন হয়ে গেছে ও এর মাঝে পরিবর্তন হয়েছে, এগুলোকে প্রকৃত অধিকারীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত না করে অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, এগুলোর সাথে অনেক মনগড়া ব্যাখ্যা, টীকা বা মন্তব্য ও তাফসীরকে সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে এবং এমন সব (অহেতুক) বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা আল্লাহ প্রদত্ত ওহী, যুক্তি এবং অনেক জিনিসের প্রকৃতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ "আল কুরআন" ঠিক ঐভাবেই স্বয়ং আল্লাহর হিফাজতে সুসংরক্ষিত রয়েছে, যে অক্ষর ও শব্দের সাথে আল্লাহ তাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। যাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংযোজিত

হয়নি। বরং মুসলমানগণও চান যে, কুরআন সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে বিশুদ্ধভাবে অবশিষ্ট থাক। ফলে তারা একে অন্য কিছুর সাথে কখনও মিলিয়ে ফেলেননি। যেমন ঃ রাসূল (ﷺ)-এর জীবন-চরিত, সাহাবাগণের জীবন-চরিত, কুরআনের তাফসীর, অথবা ইবাদত ও লেনদেনের হুকুম-আহকাম ইত্যাদি (কোন কিছুর সাথেই কুরআনকে মিলিয়ে দেননি)।

(২) বর্তমানে পূরাতন কিতাবসমূহের কোন ঐতিহাসিক সনদ (সূত্র বা প্রমাণপত্র) জানা যায় না। বরং কিছুতো এমন রয়েছে, যা কার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন ভাষায় লেখা হয়েছে তাও জানা যায় না। পরন্তু এর কিছু প্রকার এমনও রয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক করা হয় ঐ ব্যক্তির সাথে, যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়নি।

অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে (متواتر) অপরপক্ষে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে মুসলমানেরা মুহাম্মাদ (ﷺ) নিকট হতে মৌখিক ও লিখিত উভয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন। মুসলমানদের মাঝে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক নগরে এই মহাগ্রন্থ "আল কুরআনের হাজার হাজার হাফিজ এবং হাজার হাজার লিখিত কপি বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে লিখিত কপির সাথে যদি মৌখিক অনুলিপির মিল না হয়, তাহলে বিপরীত বা ভিন্ন কপিটিকে গণ্য করা হয় না। সুতরাং লেখার আকৃতিতে (মাসহাফে) যা রয়েছে তার সাথে মানুষের সীনাতে যা মুখস্ত আছে তার হুবহু মিল অবশ্যই থাকতে হবে। এর চেয়ে বড় কথা হলো যে, কুরআনকে মৌখিকভাবে (মুখস্ত করে) যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন কিতাবের সৌভাগ্য এমন হয়নি। বরং উম্মতে মুহাম্মাদী ছাড়া আর কোন জাতির মাঝে এই নাক্বল বা বর্ণনা পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কুরআন পাঠ-পঠন ও বর্ণনার নিয়ম-পদ্ধতি ঃ

ছাত্র শিক্ষককে না দেখে মুখস্ত পাঠ করে শোনাবে। শিক্ষক মহদয়ও তাঁর শিক্ষকের নিকট এমনিভাবে মুখস্ত শুনিয়েছিলেন। এভাবে শিক্ষককে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত শোনানোর শেষে শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন তাকে "ইজাযাহ" বলা হয়। এই সার্টিফিকেটের মধ্যে শিক্ষক যে প্রত্যায়ন করেন তা হচ্ছেঃ তার ছাত্র তাঁকে ঠিক ঐভাবেই

কুরআন মুখস্ত শোনায়, যেভাবে তিনি তাঁর শিক্ষককে শুনিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত সূত্র পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের স্বীয় শায়খ বা শিক্ষক মহদয়ের নাম উল্লেখ করেন। এইভাবে একজন ছাত্র থেকে রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত মৌখিক সূত্রের ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়। তেমনিভাবে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত ও সূরা কোথায় এবং কখন, নবী (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে? এর পরিচয়ের জন্য সূত্রের সাথে অনেক ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এবং শক্তিশালী প্রমাণ পরস্পর সহযোগিতা করেছে।

(৩) পূর্ববতী কিতাবগুলো যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা বহু যুগ পূর্বেই বিলীন হয়ে যায়। ফলে সেই ভাষায় কথা বলার মত লোক পাওয়া যায় না। আর বর্তমান সময়ে খুব কমই লোক আছে যারা ঐ ভাষা বোঝে। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ "আল কুরআন" যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়, তা এক জীবন্ত ভাষা, যে ভাষায় এখন কোটি কোটি মানুষ কথা বলছে। আর যদিও কেউ ঐ ভাষা শিক্ষাগ্রহণ না করে, তবুও কুরআনের অর্থ বোঝে এ ধরনের লোক আপনি প্রত্যেক জায়গায় পাবেন।

(৪) পুরাতন কিতাবগুলো নির্দিষ্ট একটি যুগের জন্য ছিল। আর তা সকল মানুষ নয় বরং একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত ছিল। এই কারণে কিছু বিধি-বিধানকে সেই যুগে, ঐ জাতির জন্য নির্ধারিতভাবে শামিল করা হয়েছিল। যদি এমনই হয়! তাহলে তা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য উপযোগী হবে না। অপর দিকে মহাগ্রন্থ "আল কুরআন" এমন একটি কিতাব যা সর্ব যুগে, সকল জায়গার মানুষের জন্য উপযোগী। আর তা এমন বিধি বিধান, লেনদেন ও আখলাক বা শিষ্টাচারকে শামিল করেছে, যা সর্ব যুগে, সকল জাতির জন্য উপযুক্ত। কারণ এর সকল বক্তব্য সকল মানুষের জন্য নির্দেশিত।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট হচ্ছে, যে সমস্ত কিতাবের মূল কপি পাওয়া যায় না, ঐ সমস্ত কিতাবের মাধ্যমে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যে ভাষায় লেখা হয়েছিল তা বিকৃতি হওয়ার পর ঐ ভাষায় কেউ কথা বলবে এমন কোন লোকও পৃথিবীর বুকে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের উপর

আল্লাহর প্রমাণ সাব্যস্ত হবে এমন কিতাবের মাধ্যমে, যে কিতাব সুসংরক্ষিত এবং সকল প্রকার বিকৃতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অতিরিক্ত কোন কিছু হতে মুক্ত। যার কপি সকল জায়গায় ছড়ানো (অর্থাৎ যে কোন জায়গায় তা পাওয়া যায়)। যা এমন এক জীবন্ত ভাষায় লিখিত যে, কোটি কোটি মানুষ তা পাঠ করে এবং মানুষের নিকট আল্লাহর বার্তা প্রচার করে। এই কিতাবটি হলঃ মহাগ্রন্থ "আল্-কুরআনুল আযীম" যা আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ করেন। তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক এবং বিকৃতি হওয়ার পূর্বে ওগুলোর সত্যায়নকারী ও সাক্ষী। অতএব সমগ্র মানবজাতির এরই অনুসরণ করা ওয়াজিব। যাতে করে তা তাদের জন্য আলোকবর্তীকা, যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকার, হেদায়াত ও রহমত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأنعام : ١٥٥]

অর্থাৎঃ আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময় ও কল্যাণময়! সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর আর (আল্লাহকে) ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। (সূরা আনআম ৬ ঃ ১৫৫)।

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف : ١٥٨]

অর্থাৎঃ (হে রাসূল ﷺ) আপনি বলে দিনঃ হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৫৮)

চতুর্থঃ নবী-পয়গাম্বরদের প্রতি বিশ্বাসঃ

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টিজীব (জ্বীন ও ইনসানের নিকট) অসংখ্য নবী-রাসূল বা দূত প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও রাসূলগণকে সত্য মনে করে, তাদেরকে তাঁরা জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সু-সংবাদ দেন, আর যদি অবাধ্য হয় তবে তাদেরকে তাঁরা জাহান্নামের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[النحل : ٣٦]

অর্থাৎঃ আর নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতের পূজা বর্জন করবে। (সূরা নাহাল ১৬ ঃ ৩৬)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো এরশাদ করেন ঃ

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء : ١٦]

অর্থাৎঃ এই রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে যেন এই রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৬৫)

এই রাসূলদের সংখ্যা অনেক। প্রথম রাসূল নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ মুহাম্মাদ (ﷺ)। তাঁদের কারো কারো সংবাদ আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যেমন- ইবরাহীম (عليه السلام), মূসা (عليه السلام), ঈসা (عليه السلام), দাউদ (عليه السلام), ইয়াহইয়া (عليه السلام), যাকারিয়া (عليه السلام) এবং সালেহ (عليه السلام)। আবার কারো সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ [النساء : ١٦٤]

অর্থাৎঃ আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে অনেক রাসূলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল রয়েছে যাদের কথা আমি তোমাকে বলিনি। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৬৪)

রাসূলগণ সবাই আল্লাহর সৃজিত মানুষ। তাদের কারো মধ্যে রুবুবিয়্যাতের (প্রভুত্বের) এবং উলুহিয়্যাতের (উপাস্যের) কোন বৈশিষ্ট্যের অংশ নেই। সুতরাং ইবাদতের কোন কিছুই তাদের জন্য করা যাবে না। তাঁরা তাদের নিজেদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না।

যেমন আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম রাসূল নূহ (عليه السلام) সম্পর্কে বলেন যে তিনি তাঁর জাতীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ [هود : ٣١]

অর্থাৎঃ আর আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি (এ কথা বলছি না যে, আমি) অদৃশ্যের কথা জানি। আর আমি এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। (সূরা হুদ ১১ ঃ ৩১)

আর আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে একথা বলার জন্য আদেশ করেন যেঃ

لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ (الأنعام : ٥٠]

অর্থাৎঃ আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ধন-ভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের কোন জ্ঞানও রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। (সূরা আনআম ৬ ঃ ৫০)

এবং আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ [الأعراف : ١٨٨]

অর্থাৎঃ (হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি বলুন ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নেই। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৮৮)

সুতরাং নবীগণ হলেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ তাদেরকে নির্বাচন করেছেন এবং রিসালাতের মহান দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আর দাসত্ব বা আনুগত্যের গুণে তাদেরকে গুণান্বিত করেছেন। তাদের সবার দ্বীন বা ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মই আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন না।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ [آل عمران : ١٩]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯)

মৌলিকভাবে তাদের সবার রিসালাত ছিল এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাদের শরীয়ত ছিল আলাদা আলাদা। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [المائدة : ٤٨]

অর্থাৎঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি নির্দিষ্ট শরীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৮)

আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়তের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে তা পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের রহিতকারী। আর তাঁর রিসালাতও সকল রিসালাতের পরিসমাপ্তকারী। আর তিনি হচ্ছেন খাতামুল আম্বিয়া বা রাসূলগণের পরিসমাপ্তকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি একজন নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার উপর সকল নবীদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি একজন নবীকে মিথ্যা মনে করে, সে যেন সকল নবী ও রাসূলকেই মিথ্যা মনে করল। কারণ সকল নবী ও রাসূলগণই আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন। আরো কারণ হল তাঁদের সবার দ্বীন বা ধর্ম এক। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মাঝে পার্থক্য করবে অথবা তাদের কারো প্রতি বিশ্বাস আনবে আর কাউকে অস্বীকার করবে, সে যেন তাদের সবাইকে অস্বীকার করল। কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই সমস্ত নাবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করেন (দেখুন ঃ আল-আক্বীদাতুস সহীহা ওয়া মা ইউযাদ্দুহাঃ পৃঃ ১৭ এবং আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল্ জামাআহঃ পৃঃ ২৫)।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ [البقرة : ٢٨٥]

অর্থাৎঃ (আল্লাহর) রাসূল তাঁর প্রতিপালক হতে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করেন); তাঁরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাগণের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসূলগণের উপর। আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না। (সূরা বাক্বারা ২ ঃ ২৮৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا - أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء : ١٥٠، ١٥١]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে যে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি আর কতিপয়কে অস্বীকার করি। এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ আবলম্বন করতে ইচ্ছা পোষণ করে, ওরাই প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী, আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৫০, ১৫১)

পঞ্চমঃ কিয়ামত বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসঃ

পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্টিজীবের শেষ খেলা মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষের গন্তব্য কোথায়? পৃথিবীতে শাস্তি পাওয়া থেকে যারা বেঁচে গেছে তার অত্যাচারের পরিণাম কী? তারা কি তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শাস্তি ভোগ করা হতে রক্ষা পেয়ে যাবে? নেককারগণের (সাওয়াবের) যে অংশ ছুটে গেছে এবং দুনিয়ায় তাদের ইহসানের প্রতিদান অর্থাৎ নেকী কি বিনষ্ট হয়ে যাবে? মানবজাতির এক প্রজন্মে পর আরেক প্রজন্ম পর্যায়ক্রমে মৃত্যুবরণ করছে। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা যখন পৃথিবী ধ্বংসের আদেশ দেবেন এবং পৃথিবীর বুক থেকে সকল সৃষ্টিকুল ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলকে ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদের পূর্বের ও পরের সকলকে একত্রিত করবেন। অতঃপর ভাল ও মন্দ যে

কর্মই বান্দাগণ দুনিয়াতে করেছে তার হিসাব নেবেন। তারপর মুমিনগণকে (স্বসম্মানে) জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, আর কাফেরদেরকে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

জান্নাত হল সেই পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা, যাকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে বিভিন্ন প্রকার যে সমস্ত নেয়া'মত রয়েছে তার বর্ণনা কেউ দিতে সক্ষম হবে না। সেখানে একশত স্তর রয়েছে। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ও তাদের আনুগত্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের অধিকারী যেখানে অবস্থান করবে। আর জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরের অধিবাসীকে ঐ নিয়া'মত দেয়া হবে যেমন দুনিয়ার কোন বাদশা উপভোগ করে; বরং তার চেয়ে দশগুণ বেশী।

আর জাহান্নাম সেই শাস্তির জায়গা, যা আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে; তার আলোচনা অন্তরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। আখেরাতে আল্লাহ যদি কাউকে মৃত্যবরণ করার অনুমতি দিতেন, তাহলে জাহান্নামবাসীরা শুধুমাত্র এর অবস্থা দেখেই মৃত্যুবরণ করত। প্রতিটি মানুষ যা বলবে বা করবে তা ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রকাশ্য হোক, অপ্রকাশ্য হোক; সব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞান থেকেই জানেন। তারপরেও তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য দু'জন ফেরেশতাকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাদের একজন ভাল আমল আর অন্যজন খারাপ আমল লেখবেন। তাদের থেকে কোন কিছুই বাদ পড়ে না।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق : ١٨]

অর্থাৎঃ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী (ফেরেশতা) তার নিকটেই রয়েছে। (সূরা ক্বাফ ৫০ ঃ ১৮)

আর এই সব আমল বা কৃতকর্ম যে দফতরে লেখা হচ্ছে, কিয়ামতের দিন মানুষকে তা দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف : ٤٩]

অর্থাৎঃ আর সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদের দেখবেন আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা বলবে! হায় আমাদের আফসোস! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি বরং সমস্ত কিছু হিসাব (লিপিবদ্ধ করে) রেখেছে; তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখেই উপস্থিত পাবে; আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না। (সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ ৪৯)।

অতঃপর তারা তা পড়বে, কিন্তু এ থেকে কোন কিছুকে অস্বীকার করতে পারবে না। যদি কেউ কোন কিছু অস্বীকার করে, তাহলে তার কান, চক্ষু, দুই হাত ও পা এবং চামড়া যা যা করেছে, আল্লাহ সে সব কর্ম সম্পর্কে সকলকে কথা বলাবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ [فصلت : ٢١ ، ٢٢]

অর্থাৎঃ আর জাহান্নামবাসীরা তাদের চামড়াকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবেঃ আল্লাহ, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। (সূরা হা-মীম-আস্সাজদাহ (ফুসসিলাত) ৪১ ঃ ২১, ২২)।

শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস তথা ক্বিয়ামত, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন দিবসের প্রতি বিশ্বাস। এর প্রতি বিশ্বাস রাখার নির্দেশ সকল নবী ও রাসূল নিয়ে এসেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [فصلت : ٣٩]

অর্থাৎঃ আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুষ্ক, অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদাহ (ফুসসিলাত) ৪১ ঃ ৩৯)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [الأحقاف : ٣٣]

অর্থাৎঃ তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। (সূরা আহক্বাফ ৪৬ ঃ ৩৩)

আর এগুলোর মধ্যে আল্লাহর হিকমত যা দাবী করে, তা হলঃ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টজীবকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে নিরর্থক ছেড়েও দেননি। বরং সব চেয়ে কম বুদ্ধির মানুষটির পক্ষেও সম্ভব নয় যে, সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া ও তার বিনা ইচ্ছায় কোন কাজ করবে। সুতরাং মানুষ এই জিনিসটি কেন খেয়াল করে না যে, এই অবস্থা যদি মানুষের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তারা তার প্রভু সম্পর্কে এ ধারণা কিভাবে করে যে, তিনি সৃষ্টিজীবকে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দিয়েছেন?। আল্লাহ সম্পর্কে তারা যা বলে, তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে ও মহান।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ [المؤمنون : ١١٥]

অর্থাৎঃ তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? (সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ ১১৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ [ص : ٢٧]

অর্থাৎঃ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারনা তাই, সুতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সোয়াদ ৩৮ ঃ ২৭)

সকল জ্ঞানবান মানুষই ক্বিয়ামত দিবসের বিশ্বাসের প্রতি সাক্ষ্য দেয়। আর এটা যুক্তিরও দাবী এবং সঠিক ফিতরাত বা স্বভাবও তা মেনে নেয়। কারণ মানুষ যদি ক্বিয়ামত দিবসকে বিশ্বাস করে, তাহলে মানুষ যা ছেড়ে দেয়, তা কেন ছেড়ে দেয়? এবং যা আমল করে, তা আল্লাহর নিকটে যে নিয়া'মত রয়েছে তা পাওয়ার আশায় আমল করে, তা সে বুঝতে পারবে। আর মানুষ তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। যদি সে ভাল আমল করে, তবে ভাল প্রতিদান পাবে। আর যদি খারাপ আমল করে, তবে প্রতিদানও খারাপ পাবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাই পুরস্কার দেয়া হবে, যা সে চেষ্টা করেছে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর আদল ও ইনসাফ বাস্তবায়িত হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة : ٧، ٨]

অর্থাৎঃ সুতরাং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎ আমল করবে সে তা দেখবে এবং যে বিন্দু পরিমাণ অসৎ আমল করবে সে তা-ই দেখবে। (সূরা যিলযাল ৯৯ ঃ ৭, ৮)। (দেখুনঃ দ্বীনুল হক্ব্ঃ পৃঃ১৯)

আর ক্বিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের কেউ জানে না। সুতরাং তা এমন একটি দিন, যা আল্লাহর কোন প্রেরিত নবী ও রাসূল এবং কোন সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাও সেদিন সম্পর্কে কিছুই জানে না। বরং তা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জ্ঞানের সাথেই নির্দিষ্ট করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ [الأعراف : ١٨٧]

অর্থাৎঃ (হে মুহাম্মাদ ﷺ!) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে, ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন ঃ এ বিষয়ের জ্ঞান

একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৮৭)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (٣٤ [لقمان : ٣٤]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। (সূরা লোকমান ৩১ ঃ ৩৪)

ষষ্ঠঃ তাক্বদীর বা ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসঃ

এই বিশ্বাস রাখবেন যে, অতীতে যা কিছু ছিল এবং বর্তমান বা ভবিষ্যতে যা কিছু হচ্ছে বা হবে, তার সব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার জানা আছে। তিনি তাঁর বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা, কর্মকাণ্ড, মৃত্যু, সময় এবং রিযিক সম্পর্কে সব কিছু জানেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [العنكبوت : ٦٢]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। (সূরা আনকাবূত ২৯ ঃ ৬২)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [الأنعام : ٥٩]

অর্থাৎঃ গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠী তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না। এমনিভাবে যে কোন সিক্ত ও শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আনআম ৬ ঃ ৫৯)

আর এই জানা জিনিসকে তিনি তাঁর নিকট লাওহে মাহফূজে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢) [يس : ١٢]

অর্থাৎঃ এবং আমি প্রতিটি বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ১২)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা আরো বলেনঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحج : ٧٠]

অর্থাৎঃ আপনি কি জানেন না যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তার সব কিছুই জানেন? নিশ্চয়ই তাা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আর উহা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৭০)

ফলে আল্লাহ তা'য়ালা যখনই কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু তার জন্য বলেনঃ হও, আর তা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس : ٨٢]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেনঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়সীন ৩৬ ঃ ৮২)

আল্লাহ তা'য়ালা যেমন প্রত্যেকটি জিনিসের (তাকদীর) নির্ধারণ করেছেন, তেমনি প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টাও তিনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر : ٤٩]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সূরা ক্বামার ৫৪ ঃ ৪৯)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الزمر : ٦٢]

অর্থাৎঃ আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৬২)

তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁরই আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আনুগত্য কী? তাদেরকে তাও বর্ণনা করেছেন। এই আনুগত্য করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। অবাধ্যতা কী? তাও তাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদেরকে সামর্থ ও ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন, যাতে করে তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশিত কাজ আঞ্জাম দিয়ে সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে। আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করবে, সে শাস্তির উপযোগী হবে।

মানুষ আল্লাহর ফায়সালা ও তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে যে উপকার লাভ করবে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) কারণ বা উদ্দেশ্য নির্বাচন করার সময় আল্লাহর উপর তার আস্থা হয়। কেননা সে জানে যে, উদ্দেশ্য ও ফলাফল উভয়ই আল্লাহর হুকুম ও তাক্বদীর অনুযায়ী হয়।

(২) মানসিক শান্তি ও আত্মতৃপ্তি লাভ হয়। কারণ যখনই সে জানবে যে, এ সব আল্লাহর হুকুম ও তাক্বদীর অনুযায়ী এবং নিয়তি-নির্ধারিত অপছন্দনীয় যা নিশ্চিতরূপ হবেই, তখন তার আত্মতৃপ্তি হয় এবং আল্লাহর ফায়সালার (তাক্বদীরের) প্রতি সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং যে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার চাইতে সর্বোত্তম জীবনযাপনকারী, সুখকর মন ও অধিক শক্তিশালী শান্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই।

(৩) উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জনের সময় মনের অহমিকতামূলক আনন্দ দূর করে। কেননা তা অর্জন কল্যাণ ও সফলতা লাভের উপায়সমূহের অন্তর্গত আল্লাহর এমন একটি নেয়া'মত যা তিনি তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। ফলে সে এই ব্যাপারে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

(৪) উদ্দিষ্ট বস্তু হাত ছাড়া হওয়া অথবা অপছন্দনীয় বস্তুতে পতিত হওয়ার সময় অসন্তোষ ও মনঃকষ্টকে বিদূরিত করে। কারণ এসব কিছু আল্লাহর হুকুমে হয়, যার হুকুমের কেউ বাধাদানকারী ও নিবারণকারী নেই। তাতো নিশ্চিতরূপে হবেই। অতএব সে ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর কাছে সাওয়াব আশা করে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد : ٢٢، ٢٣]

অর্থাৎঃ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদই আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা হতাশাগ্রস্ত না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্যে গৌরবে ফেটে না পড়। আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও অহঙ্কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা হাদীদ ৫৭ ঃ ২২, ২৩)। (দেখুন ঃ আল-আক্বীদাতুস সহীহা ওয়ামা ইউযাদ্দুহাঃ ১৯ নং পৃঃ, আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল্ জামাআহ ঃ ৩৯ নং পৃঃ এবং দ্বীনুল হক্ব; ১৮ নং পৃষ্ঠা)।

(৫) আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপিত হয়। কারণ মুসলমান জানে যে, উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। সুতরাং সে কোন শক্তিধর ব্যক্তিকে ভয় করে না এবং কোন মানুষের ভয়ে কোন মঙ্গলজনক কর্ম করতে অবহেলাও করে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে লক্ষ্য করে বলেনঃ জেনে রাখবে যে, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোন উপকার করতে পারবে না; আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসনাদ ইমাম আহমাদঃ ১ম খণ্ড; ২৯৩ নং পৃঃ এবং তিরমিযিঃ ক্বিয়ামত অধ্যায়; ৪র্থ খণ্ড,৭৬ নং পৃষ্ঠা)

তৃতীয় স্তরঃ ইহসান

এর একটি মাত্র রোকন বা স্তম্ভ, আর তা হচ্ছেঃ আপনি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি এমনটি মনে করা সম্ভব না হয়, তবে একথা জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয়ই

তিনিই আপনাকে দেখছেন। অতএব এই পদ্ধতিতে মানুষ তার রবের ইবাদত করবে। এটা হচ্ছে তাঁর নিকটে ও তাঁর সামনে নিজেকে উপস্থিত করা। আর তা আল্লাহর ভয়, প্রভাব ও শ্রদ্ধাকে অপরিহার্য করবে এবং তা ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতাকে এবং ইবাদতকে পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে আদায় করার জন্য চেষ্টা করাকেও অপরিহার্য করবে। সুতরাং ইবাদত করার সময় বান্দা তাঁর প্রভুকে স্মরণ করবে এবং নিজেকে এমনভাবে তাঁর নিকট উপস্থিত করবে, যেন সে তাঁকে দেখছে। কিন্তু যদি তার পক্ষে এটা অনুধাবন করা সম্ভব না হয়, তবে তা বাস্তবায়ন করার জন্য সে যেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাহায্য চায় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে দেখছেন। তিনি তার গোপন, প্রকাশ্য, ভিতর, বাহির সব বিষয় জানেন। তার কর্মকাণ্ডের কোন কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। (দখুনঃ জামিউল উলূম ওয়াল হিকামঃ ১২৭ পৃষ্ঠ)।

অতএব আল্লাহর যে বান্দা এই অবস্থানে পৌঁছে, সে আন্তরিকভাবে তার প্রভুর ইবাদত করে। আর তিনি ব্যতীত আর কারো দিকে সে নজর দেয় না। ফলে সে কোন মানুষের প্রশংসা শোনার অপেক্ষায় থাকে না এবং তাদের তিরস্কারকেও সে ভয় করে না। বরং তার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার প্রভু তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং স্বীয় বান্দার তিনি প্রশংসা করবেন। সুতরাং সে এমন একজন মানুষ যার গোপন ও প্রকাশ্য সমান এবং নির্জনে ও প্রকাশ্যে সে তার প্রভুর একজন ইবাদতকারী। সে এ ব্যাপারে পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসী যে, তার অন্তরে যা রয়েছে এবং তার আত্মা যা কুমন্ত্রণা দেয়, তার সব কিছুই আল্লাহ পাক অবগত আছেন। ঈমান বা বিশ্বাস তার অন্তরকে প্রভাবিত করে এবং সে মনে করে যে, তার প্রভু তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। যার কারণে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে সে তার প্রভুর অনুগত বান্দা হয়ে ওগুলো দ্বারা শুধুমাত্র এমন সব আমলই করে, যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। আর যখন তার অন্তর তার প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন সে আর কোন সৃষ্টিকূলের নিকট সাহায্য চায় না। কেননা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় সে অন্যদের থেকে অভাবমুক্ত হয়ে পড়ে। সে কোন মানুষের নিকট অভিযোগ করে না, কারণ সে তার সকল অভাব ও চাহিদা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে। সাহায্যকারী হিসাবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। সে কোন স্থানে নির্জনতা অনুভব করে না এবং কাউকে ভয়ও

করেনা। কারণ সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তার সঙ্গে আছেন। তিনিই তার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

আল্লাহ তাকে যে আদেশ করেছেন তা সে পরিত্যাগ করে না এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন গুনাহের কাজও করে না। কারণ সে আল্লাহকে ভীষণ লজ্জা পায়। তিনি যখন তাকে আদেশ করেছেন তখন সে তা নষ্ট করবে অথবা তিনি যখন তাকে নিষেধ করেছেন তখন সে তা করবে, এটাকে সে অপছন্দ করে। সে কোন সৃষ্টিজীবের প্রতি জুলুম বা বাড়াবাড়ি করে না। অথবা সে কারো হক্বও ছিনিয়ে নেয় না, কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার সব কিছু অবগত আছেন। পূত-পবিত্র আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তার হিসাব নেবেন।

সে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না, কারণ সে জানে, এর মধ্যে যা কিছু মঙ্গলময় বস্তু রয়েছে তার সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি সেগুলোকে তাঁর সৃষ্টিজীব মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে তারা তাদের প্রয়োজন মাফিক তা হতে গ্রহণ করে। আর এগুলোকে তার জন্য সহজ করে দেয়ার কারণে সে আপন প্রতিপালকের শুকরিয়া আদায় করে। অত্র কিতাবের মধ্যে আপনার সামনে এতক্ষণ যা উপস্থাপন করা হল, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামের মহান রোকন বা স্তম্ভ। আল্লাহর কোন বান্দা যদি এ সমস্ত রোকনের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তা পালন করে তবে সে মুসলমান হয়ে যাবে। তা না করলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই ইসলাম হচ্ছে দ্বীন-দুনিয়া, ইবাদত ও জীবনের পথ বা পন্থা। আর তা আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা পরিপূর্ণ ও ব্যাপক। যার বিধানের মধ্যে সার্বিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সমানভাবে ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেকের যা প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চাই তা আকীদা-বিশ্বাসগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইত্যাদী যে কোন বিষয়কই হোক না কেন। মানুষ এর মধ্যে এমন অনেক নিয়ম-নীতি ও হুকুম-আহকাম পাবে যা নিরাপত্তা, যুদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহকে সুশৃংখল করে। মানুষের সম্মান, পশু-পাখি, জীব-জন্তু এবং তার চার পাশের পরিবেশকে সংরক্ষণ করে। তার নিকট মানুষ, জীবন-মৃত্যু এবং মরণের পর পুনরুত্থানের হাক্বীকাত বা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে সে আরো পাবেঃ তার চার পাশে যে সব মানুষ রয়েছে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (٨٣) [البقرة : ٨٣]

অর্থাৎঃ আর তোমরা মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে। (সূরা বাকারা ২ ঃ ৮)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎঃ আর যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৩৪)

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة : ٨]

অর্থাৎঃ কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবে না, তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা তাক্বওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৮)

দ্বীনের স্তরসমূহ ও তার প্রতিটি স্তরের রোকনসমূহের আলোচনার পর এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে দ্বীন ইসলামের কতিপয় আদর্শ বা গুণাবলী আলোচনা করা ভাল মনে করছি।

ইসলাম ধর্মের কতিপয় আদর্শ ও গুণাবলীঃ[১৪]

ইসলামের গুণাবলীকে (লিখে) বেষ্টন করতে কলম অপারগ হয়ে যায় এবং এই দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব পুরাপুরী বর্ণনা করতে শব্দগুচ্ছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কারণ আর কিছু নয়; বরং এর প্রকৃত কারণ হলঃ এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর (একমাত্র মনোনীত) দ্বীন। অতএব চক্ষু যেমন আল্লাহকে উপলব্ধি করার দিক দিয়ে আয়ত্ত করতে পারবে না, তেমনি মানুষও জ্ঞানের মাধ্যমে

১৪. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুনঃ শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী প্রণীত "আদ্ দুররাতুল মুখতাসারাহ ফী মাহাসিনিদ্দীনিল ইসলামী" এবং শায়খ আব্দুল আযীয সালমান প্রণীত "মাহাসিনুল ইসলাম" কিতাবদ্বয়।

তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'য়ালার শরীয়তও, যার গুণাবলী বর্ণনা করে– কলম তাকে বেষ্টন করতে পারবে না। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ "আপনি যদি এই মজবুত ও নির্ভেজাল দ্বীন এবং মুহাম্মাদী শরীয়তের ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করেন, প্রকাশভঙ্গি যার উৎকর্ষতাকে অর্জন করতে পারে না। বর্ণনা যার সৌন্দর্যতার নাগাল পায় না, জ্ঞানীদের জ্ঞান যার উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যদিও তা একত্রিত হয় এবং তা তাদের সব চেয়ে পরিপূর্ণ মানুষটির মধ্যে হয়। বরং উত্তম ও পূর্ণ জ্ঞান অনুযায়ী সে তার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করবে। তাহলে দেখবেন, কোন বুদ্ধিমান এর চেয়ে পরিপূর্ণ, সুমহান ও মহত্তর শরীয়তের (দ্বীনের) সাক্ষাত পায়নি।

রাসূল বা দূত যদি এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নাও নিয়ে আসতেন, তবে অবশ্যই এর জন্য প্রমাণ, নিদর্শন ও সাক্ষী হিসেবে এটাই যথেষ্ট হত যে, নিশ্চয়ই তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর এগুলো প্রত্যেকটি জ্ঞান ও হিকমতের পূর্ণাঙ্গতা, রহমত, সততা ও বদান্যতার প্রশস্ততা, প্রকাশ্য ও অদৃশ্যকে বেষ্টন এবং শুরু ও শেষ ফলাফলের জ্ঞানের সাক্ষী। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে যে সব বড় বড় নেয়া'মত দান করেছেন তার মধ্যে এটিও একটি। ফলে তিনি তাদেরকে এর হেদায়েত করেছেন, এর অনুসারী করেছেন এবং এর জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন নেয়া'মত তিনি তাদেরকে দান করেননি। অতএব এ কারণেই তিনি তাঁর বান্দাদের অনুগ্রহ করে এর হেদায়েত দান করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [آل عمران : ١٦٤]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি

তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল। (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১৬৪)

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের পরিচয় প্রদান করে, তাদের প্রতি স্বীয় মহান নেয়া'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং তাদেরকে এর অনুসারী করায়, তাঁর শুকরিয়া আদায় করার আহ্বান করে এরশাদ করেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [المائدة : ٣]

অর্থাৎঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়া'মত সম্পূর্ণ করলাম। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৩) (দেখুনঃ মিফতাহু দারিস সাআদাহঃ ১ম খণ্ড; ৩৭৪ ও ৩৭৫ নং পৃষ্ঠা)

এই দ্বীনের যে আদর্শ ও গুণাবলীর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত তার কতিপয় আলোচনা করা হলঃ

(১) এটি আল্লাহর দ্বীনঃ

এটি এমন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা, যা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। এর দিকে আহ্বানের জন্য তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং মানবমণ্ডলীকে তিনি এর গণ্ডির মধ্যে থেকেই তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সাথে যেমন সৃষ্টিকুলের সাদৃশ্য নেই, তেমনিভাবে তাঁর দ্বীন "ইসলামের" সাথে মানুষের আইন - কানুন ও তাদের রচিত দ্বীনের সাদৃশ্য নেই। মহান আল্লাহ যেমন সাধারণ পূর্ণাঙ্গতায় গুণান্বিত হয়েছেন, তেমনিভাবে শরীয়তকে পূরণ করার ক্ষেত্রে যা মানুষের জীবনকাল ও পরকালের জন্য উপযোগী এবং মহান স্রষ্টার অধিকারসমূহ ও তাঁর প্রতি বান্দার কর্তব্যসমূহ, বান্দার কতকের উপর কতকের অধিকারসমূহ ও কতকের জন্য কতকের কর্তব্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে, তাঁর দ্বীন ইসলামেরও সাধারণ পূর্ণাঙ্গতা রয়েছে।

(২) সকল বিষয়ের সমাহার বা ব্যাপকতাঃ

এই দ্বীনের উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর একটি হচ্ছে; প্রত্যেক বিষয়ের সমাহার ও তার ব্যাপকতা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام : ٣٨]

অর্থাৎঃ কিতাবে আমি কোন বস্তুর কোন বিষয়ই (লিপিবদ্ধ করতে) বাদ দেয়নি। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ৩৮)

অতএব এই দ্বীন স্রষ্টার সাথে যা সম্পৃক্ত এমন প্রত্যেক বিষয় যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালার নাম, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর অধিকারসমূহ এবং সৃষ্টিজীবের সাথে যা সংশ্লিষ্ট এমন প্রত্যেক বিষয়, যেমনঃ আইন- কানুন, দায়িত্ব, আখলাক বা নৈতিকতা, লেনদেন ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই দ্বীন পূর্ব ও পরের সমস্ত মানুষ, ফেরেশতামণ্ডলী এবং নবী ও রাসূলগণের সংবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। তেমনি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, নক্ষত্ররাজি, সাগর-মহাসাগর, গাছ-পালা, ও নিখিল বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা আছে। সৃষ্টির কারণ, লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তার সমাপ্তি, জান্নাত ও মুমিনদের ফলাফল, জাহান্নাম ও কাফেরদের শেষ পরিণতি সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে।

(৩) সৃষ্টিজীবের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক স্থাপন করেঃ

প্রত্যেক বাতিল দ্বীন ও সম্প্রদায় মানুষকে মৃত্যু, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে তার মত মানুষের সাথে জুড়ে দেয়। বরং কখনও কখনও তাকে এমন মানুষের সাথে জুড়ে দেয়, যে কয়েক শত বছর পূর্বে মরে গিয়ে হাড্ডিসার হয়েছে। পক্ষান্তরে এই দ্বীন তথা "ইসলাম" মানুষকে সরাসরি তার প্রতিপালকের সাথে জুড়ে দেয়। ফলে তাদের মাঝে কোন পুরোহিত, সাধক এবং গোপন পবিত্রকারী কেউ নেই। বরং তা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীবের মাঝে সরাসরি সংযোগ স্থাপন। এমন সংযোগ যা অন্তরকে তার প্রতিপালকের সাথে সমৃক্ত করে। যার ফলে সে (হেদায়েতের) আলো পায়, (হক্ব) পথের সন্ধান চায়, মর্যাদাবান ও বড় হয়, পূর্ণাঙ্গতা সন্ধান করে এবং নীচ ও নগণ্য হতে নিজেকে উঁচু মনে করে। সুতরাং প্রত্যেক অন্তর, যে তার প্রতিপালকের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি সে চতুষ্পদ জীব-জন্তুর চেয়েও অধিক বিপথগামী। আর এটা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এমন এক সংযোগ, যার মাধ্যমে তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্য কি? তা জানতে পারে।

ফলে সে জেনে বুঝে তাঁর ইবাদত করে। তাঁর সন্তুষ্টির স্থান ও কারণসমূহ জানতে পারে, ফলে সে তা চায় এবং তাঁর অসন্তোষের স্থানসমূহও জানতে পারে, ফলে সে তা বর্জন করে। এটা মহান সৃষ্টিকর্তা ও দুর্বল এবং অভাবী সৃষ্টির মাঝে সংযোগ স্থাপন। ফলে সে তাঁর নিকট সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফীক কামনা করে এবং সে আরো চায় যে, তিনি যেন তাকে চক্রান্ত কারীর চক্রান্ত হতে ও শয়তানের খেল তামাশা হতে হেফাজত করেন।

(৪) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি মনোযোগঃ

ইসলামী শরীয়ত দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং চারিত্রিক উত্তম গুণাবলী পূর্ণ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আখেরাতের কল্যাণের বর্ণনাঃ এই শরীয়ত তার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছে। কোন কিছুই উপেক্ষা করেনি। বরং তার কোন কিছুই যেন অজ্ঞাত না থাকে, এ জন্য তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। ফলে (পুণ্যবানগণকে) তার নেয়া'মতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর (গুনাহগারদেরকে) তার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছে।

পার্থিব কল্যাণের বর্ণনাঃ আল্লাহ তা'য়ালা এই দ্বীনে মানুষের নিজ ধর্ম, জীবন, সম্পদ, বংশ, সম্মান ও জ্ঞানের সংরক্ষণের সঠিক বিধান করে দিয়েছেন।

চারিত্রিক উত্তম গুণাবলীর বর্ণনাঃ যেমন প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা এর নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এর যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও নিকৃষ্টতা থেকে নিষেধ করেছেন। বাহ্যিক উত্তম গুণাবলী যেমনঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকা, সুগন্ধি ব্যবহার এবং সর্বদা সুন্দর ও সজ্জিত থাকা ইত্যাদি। খারাপ কর্মসমূহকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন যেমনঃ যেনা-ব্যাভিচার, মদপান, মৃত, রক্ত ও শুকরের গোস্ত ভক্ষণ ইত্যাদি। পবিত্র বস্তুসমুহকে তিনি খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপচয় ও অপব্যয় করাকে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে আভ্যন্তীরণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ঃ নিন্দিত আখলাক বা আচরণ ছেড়ে দেয়া এবং প্রশংসনীয় ও সুন্দর স্বভাবে সজ্জিত হওয়া। নিন্দিত আখলাক বা আচরণ, যেমনঃ মিথ্যা, পাপাচার, রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ,

কৃপণতা, সঙ্কীর্ণতা, দুনিয়া ও সুখ্যাতি অর্জনের লোভ, অহঙ্কার, বড়াই, রিয়া বা কপটতা।

আর প্রশংশিত আখলাকের মধ্যে যেমনঃ উত্তম চরিত্র, মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রতি ইহসান করা। ন্যায়পরায়ণতা, বিনয়-নম্রতা, সত্যবাদিতা, উদার মন, ত্যাগ, আল্লাহর উপর ভরসা, ইখলাস বা আন্তরিকতা, আল্লাহ ভীতি, ধৈর্য, শোকর ইত্যাদি। (দেখুনঃ ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রণীত "আল-ই'লাম বিমা ফী দ্বীনিন্নাসারা মিনাল ফাসাদি ওয়াল আওহাম ঃ ৪৪২-৪৪৫ পৃঃ)

(৫) সহজসাধ্যঃ

এই দ্বীন যে সব গুণাবলীতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে তার মধ্যে একটি হল; সহজ ও সরলতা। অতএব দ্বীনের প্রতিটি পর্ব এবং প্রতিটি ইবাদতই সহজ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ([الحج : ٧٨]

অর্থাৎঃ আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নেই। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৭৮)

আর এই সহজসাধ্যের সর্বপ্রথম তো এই যে, যদি কেউ এই দ্বীনে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তার কোন মানুষের মধ্যস্থতা গ্রহণ অথবা পূর্ববর্তী কোন স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। বরং তার যা দরকার তা হচ্ছেঃ সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবে এবং বলবেঃ

أشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله

অর্থাৎঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই আর মুহম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল বা দূত।

এই দুই সাক্ষ্যের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার দাবী ও চাহিদা মোতাবেক আমল করবে। অতএব যখন মানুষ সফর করে অথবা অসুস্থ হয়, তখন প্রত্যেকটি ইবাদতের মধ্যেই সহজসাধ্যতা ও শিথীলতা প্রবেশ করে। ফলে সে গৃহে অবস্থানরত ও সুস্থ্য অবস্থায় যেমন আমল করত অনুরূপ আমলই তার (আমলনামায়) লেখা হয়। বরং

মুসলমানের জীবন কাফেরের তুলনায় সহজ ও শান্তিময়। আর কাফেরের জীবন হয় দুঃখ-কষ্টময় ও কঠিন। তেমনই মু'মিনের মৃত্যুও হয় অতি সহজভাবে, ফলে তার আত্মা (এত আরামে) বের হয়, যেমন পাত্র থেকে (অতি সহজে ও আরামে) পানির ফোঁটা বের হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [النحل : ٣٢]

অর্থাৎঃ ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়; তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জন্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩২)

পক্ষান্তরে কাফেরের মৃত্যুর সময় তার নিকট কঠোর ও খুব শক্তিশালী ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয় এবং তাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করতে থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ [الأنعام : ٩٣]

অর্থাৎঃ (হে রাসূল!) আর আপনি যদি (ঐ সময়ের অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণার সম্মুখীন হবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবেঃ তোমাদের প্রাণগুলো বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে অহঙ্কার প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে। (সূরা আনআম ৬ ঃ ৯৩)।

তিনি আরো বলেনঃ

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ [الأنفال : ٥٠]

অর্থাৎঃ (হে রাসূল!) আর আপনি যদি (ঐ অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেন আর বলেনঃ তোমরা জাহান্নামের দহনযন্ত্রণা ভোগ কর। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৫০)

(৬) ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতাঃ

নিশ্চয়ই যিনি ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তিনি একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সাদা-কালো, নারী-পুরুষ সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর হুকুম-আহকাম, ন্যায়বিচার ও রহমতের ক্ষেত্রে সবাই সমান। তিনিই নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের জন্য তেমনই শরীয়ত করেছেন যা তাদের জন্য উপযোগী। অতএব এমতাবস্থায় শরীয়ত নারীর তুলনায় পুরুষকে সুবিধা দেবে, অথবা নারীকে প্রাধান্য দেবে আর পুরুষের প্রতি জুলুম করবে, অথবা সাদা বর্ণের মানুষকে কোন বিশেষ গুণে বিশিষ্ট করবে আর কালো বর্ণের মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করবে এটা অসম্ভব। বরং সবাই আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সমান। একমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি ছাড়া তাদের মাঝে আর কোন পার্থক্য নেই।

(৭) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধঃ

এই শরীয়ত একটি মহৎ ও সম্ভ্রান্ত গুণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা হল; সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ। ফলে প্রত্যেক ক্ষমতাবান, জ্ঞানী, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নর ও নারীর উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা ওয়াজিব। এটা করবে আদেশ ও নিষেধের স্তর হিসাবে যেমন; সে আদেশ ও নিষেধ করবে তার হাত দ্বারা। কিন্তু যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তবে মুখ বা যবান দ্বারা করবে। কিন্তু তাও যদি করতে সক্ষম না হয়, তবে সে তার অন্তর দ্বারা করবে। আর এরই মাধ্যমে সম্পূর্ণ (মুসলিম) জাতি স্বীয় জাতির তত্ত্বাবধায়ক হয়ে পড়বে। সুতরাং যারাই মঙ্গলজনক কাজে অবহেলা করে অথবা নিকৃষ্ট কাজ করে তাদের প্রত্যেককে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা প্রতিটি ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। চাই সে শাসক হোক অথবা শাসিত হোক, তার সামর্থ অনুযায়ী এবং ঐ শারয়ী নিয়ম-

নীতি মোতাবেক হবে, যা এই (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধের) বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে।

অতএব এই বিষয়টি যেমন আপনি লক্ষ্য করছেন! (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সামর্থ অনুযায়ী ওয়াজিব। যে সময়ে অনেক সমসাময়িক রাজনৈতিক দল গর্ববোধ করে যে, তারা তাদের বিরোধী দলগুলোকে সরকারী কাজ-কর্মের প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার এবং সরকারী আসবাবপত্র ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। এগুলো দ্বীনের সামান্য কতিপয় গুণাবলী। আপনি যদি আরো বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে ইসলামের প্রতিটি বিধান, প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ বণনা করার জন্য আপনাতে অবশ্যই থেমে যেতে হবে। কারণ তাতে রয়েছে পরিপূর্ণ হিকমত, মজবুত বিধান, পূর্ণ সৌন্দর্য এবং এমন পূর্ণাঙ্গতা যার কোন উদাহরণ নেই। আর যে ব্যক্তি এই দ্বীনের (ধর্মের) বিধানাবলীকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা বা গবেষণা করবে, সে সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে। তা এমন চির সত্য, যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এবং এমন হেদায়েত সম্বলিত (পথ প্রদর্শন) যার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রষ্টতা নেই। সুতরাং আপনি যদি আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে, তাঁর শরীয়তকে মেনে চলতে এবং তাঁর নবী-রসূল বা পয়গাম্বরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান, তাহলে এখনও আপনার সামনে তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। আর আপনার মহান প্রতিপালক, যিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, তিনি আপনার যাবতীয় পাপরাশীকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আপনাকে আহ্বান করছেন।

তাওবা

নবী (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো যারা তাওবা করে। (মুসনাদ ইমাম আহমাদঃ ৩য় খণ্ড, ১৯৮ নং পৃঃ; তিরমিযিঃ কিয়ামতের বর্ণনা পরিচ্ছেদ; ৪র্থ খণ্ড, ৪৯ নং পৃঃ এবং ইবনে মাজাঃ যুহুদ পর্ব ঃ ৪র্থ খণ্ড, ৪৯১ পৃঃ)

মানুষ তার মনের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল, তেমনিভাবে সে তার দৃঢ় ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও খুব দুর্বল। তাই সে তার ত্রুটি ও গুনাহের দায়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখেনা। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের প্রতি

সদয় হয়ে হালকা করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য তাওবার বিধান চালু করেছেন। সত্যিকার তাওবা হচ্ছে ঃ গুনাহের কারণে আল্লাহর ভয়ে এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে নেয়ামতসমূহের যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তার আশায় পাপ পরিত্যাগ করা। পূর্বে তার দ্বারা যে সব পাপ হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া। কৃত পাপ পুনরায় না করার উপর দৃঢ় সঙ্কল্প করা। জীবনের বাকী সময় সৎ আমলের দ্বারা পূরণ করা। (আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআনঃ ৭৬ পৃঃ (কিছু পরিবর্তিত)।

লক্ষ্য করুন যে, এগুলো হলো আন্তরিক কাজ, যা তার ও তার রবের মাঝে হয়ে থাকে। যাতে কোন পরিশ্রম, কষ্ট ও কঠিন কাজের যন্ত্রণাও নেই। বরং তা হচ্ছে অন্তরের কাজ পাপ পরিত্যাগ করা এবং পুনরায় তা না করা। আর নিবারণের মাঝেই রয়েছে ত্যাগ ও শান্তি। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম রচিত "আল ফাওয়াইদঃ ১১৬)

সুতরাং কোন মানুষের হাত ধরে তাওবা করার প্রয়োজন নেই, যে আপনার সম্ভ্রম নষ্ট করবে, আপনার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে দেবে এবং আপনার দুর্বলতাকে ব্যবহার করবে। বরং তা আপনার ও আপনার রবের মাঝে নিভৃত গোপন কথা। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন ও হেদায়েত চান। তিনি আপনার তাওবা কবুল করবেন। সুতরাং ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন গুনাহ নেই এবং নিষ্কৃতি বা উদ্ধারকারী প্রতীক্ষিত কোন মানুষও নেই। বরং যেমন তা এক অস্ট্রীয় নাগরিক মুহাম্মাদ আসাদ নামক ইয়াহুদী যিনি পরবর্তীতে ইসলামের হেদায়েত প্রাপ্ত হন, তিনি তার গবেষণাকালে খুঁজে পান। তিনি বলেন ঃ আমি কুরআনের মধ্যে যে কোন স্থানে যা-ই বর্ণিত হয়েছে সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন খুঁজে পেতে সক্ষম হয়নি (অর্থাৎ এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই তা খুঁজে পায়নি) আর ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রথম কোন গুনাহ নেই, যা কোন ব্যক্তি ও তার পরিণামের মাঝে অবস্থান করে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) [النجم : ٣٩]

অর্থাৎঃ আর মানুষ তা-ই পায় যা সে চেষ্টা করে। (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ৩৯)।

আর মানুষের কাছে দাবী করা হয় না যে, সে কিছু উৎসর্গ পেশ করুক অথবা নিজে নিজেকে হত্যা করুক; যাতে করে তার জন্য তওবার দরজা খোলা হয় এবং গুনাহ থেকে মুক্তি পায়। (মুহাম্মাদ আসাদ রচিত 'আত ত্বরীকু ইলাল ইসলাম ঃ ১৪০ সামান্য পরিবর্তিত)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[النجم : ٣٨]

অর্থাৎঃ অবশ্যই কোন পাপী অন্য কারো পাপ বহন করবে না। (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ৩৮)।

তাওবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা ও প্রভাব রয়েছে। এখানে কিছু উপস্থাপন করছিঃ

(১) বান্দা আল্লাহর ধৈর্য এবং তাঁর উদারতার প্রশস্ততা জানতে পারে যখন তিনি তার গুনাহকে গোপন রাখেন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে গুনাহর কারণে তাৎক্ষণিক তাকে শাস্তি দিতে এবং অন্যান্য বান্দার সামনে তাকে লাঞ্ছিত করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে তার জীবনযাত্রা ভাল হতো না। বরং তিনি তাকে গোপন করার মাধ্যমে সম্মানিত করেন, তাঁর ধৈর্য দিয়ে তাকে ঢেকে দেন এবং শক্তি, সামর্থ্য ও খাদ্য-খোরাক দিয়ে তাকে সাহায্য করেন।

(২) তওবাকারী তার আত্মার হাক্বীকত জানতে পারে– তা হলো খারাপ কাজের উস্কানিদাতা। সুতরাং তা হতে যে সব ভুল-ভ্রান্তি, পাপ ও ব্যর্থতা প্রকাশ পায়, তা আত্মার দুর্বলতা এবং ধৈর্য ও নিষিদ্ধ প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার প্রমাণ। আর সে আত্মার বিষয়ে চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যেও আল্লাহর অমুখাপেক্ষী নয়, যাতে করে সে তা পবিত্র করবে ও হেদায়েত করবে।

(৩) মহান আল্লাহ তওবার বিধান করেন, যাতে করে ওর মাধ্যমে বান্দার সৌভাগ্যের সব চেয়ে বড় উপায় অর্জিত হয়। তাওবা হলো; আল্লাহর আশ্রয় বা শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া। অনুরূপ তাওবার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ইবাদত যেমন; দোয়া, বিনয়,

মিনতি, অভাব, ভালবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদি অর্জিত হয়। ফলে আত্মা তাঁর স্রষ্টার একান্ত নিকটবর্তী হয়ে যায়। যা তওবা ও আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা অর্জিত হয় না।

(৪) আল্লাহ তা'য়ালা তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [الأنفال : ٣٨]

অর্থাৎঃ (হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি কাফিরদেরকে বলুনঃ তারা যদি কুফরি থেকে বিরত থাকে (এবং তাওবা করে) তবে পূর্বে যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি কুফুরির পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তী (কাফের) জাতিসমূহের সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল তা তো অতীত ঘটনা (অর্থাৎ শাস্তি অনিবার্য)। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩৮)

(৫) মানুষের পাপগুলো পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان : ٧٠]

অর্থাৎঃ তবে যারা তাওবা করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ আমল করে আল্লাহ তাদের পাপসমূহ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরক্বান ২৫ ঃ ৭০)

(৬) মানুষ তার স্বগোত্রীয়দের সাথে তাদের খারাপ আচরণ ও তাকে অপমান করার ক্ষেত্রে এমন আচরণ করবে, যেমন সে নিজে আল্লাহর সাথে খারাপ আচরণ ও তাকে অমান্য করা ও তার সাথে পাপ করলে সে তার নিজের ক্ষেত্রে আল্লাহর যে আচরণ পছন্দ করে। কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল। সুতরাং মানুষ যখন অন্যের সাথে এ উত্তম আচরণ করে, তখন সেও আল্লাহর পক্ষ হতে অনুরূপ সদ্ব্যবহার পাবে। তা হল মহান আল্লাহ নিজ ইহসান দ্বারা তার খারাপ আচরণ ও পাপকে বদলিয়ে দিবেন, যেমন সে তার সাথে মানুষের খারাপ আচরণকে বদলিয়ে দেয়।

(৭) সে জানবে যে, তার অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে। ফলে এটা তাকে অন্য মানুষের দোষ-ত্রুটি ধরা হতে বিরত থাকতে বাধ্য করবে। আর অন্যদের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হতে নিজেকে সংশোধন করার ব্যাপারে সে ব্যস্ত থাকবে। (দেখুন ঃ মিফতাহুস সা'আদাহ ঃ ১ম খণ্ড; ৩৫৮, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

পরিশেষে এই পর্বটি শেষ করব এমন এক ব্যক্তির খবরের মাধ্যমে, যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে আরজ করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ছোট-বড় এমন কোন অপরাধ নাই যা আমি করিনি (অর্থাৎঃ আমি সকল প্রকার পাপের কাজ করেছি)। রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দেবেনা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল বা দূত?। রাসূল (ﷺ) কথাটি তিন বার বলেন। লোকটি বললেনঃ জী, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। রাসূল (ﷺ) বলেনঃ এই সাক্ষ্য প্রদান ঐ পাপকে মিটিয়ে দেবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ নিশ্চয়ই এই সাক্ষ্য প্রদান ঐ সমস্ত সকল পাপকে মিটিয়ে দেবে। (মুসনাদে আবী ইয়া'লাঃ ৬ নং খণ্ড, ১৫৫ নং পৃষ্ঠা। ইমাম ত্বারানী প্রণীত মু'জামুল আউসাত্বঃ ৭ নং খণ্ড, ১৩২ নং পৃষ্ঠা ও আল্ মু'জামুস স্বগীরঃ ২য় খণ্ড, ২০১ নং পৃষ্ঠা।)

ইমাম জিয়া মাক্বদেসী তার আল্ মুখতারাহ কিতাবের ৫ম খণ্ড, ১৫১ ও ১৫২ নং পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ, আর তিনি মাজমা' গ্রন্থের ১০ খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ অনুরূপ হাদীস ইমাম আবূ ইয়ালা ও ইমাম বায্যার এবং ইমাম ত্বারানী তাঁর আল্ মু'জামুস স্বগীর ও আল মু'জামুল আউসাত্বেও বর্ণনা করেন। তাদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কী, যে সকল প্রকার পাপ করেছে, কিন্তু আল্লাহর সাথে কোন প্রকার শিরক স্থাপন করেনি? ছোট বড় এমন কোন পাপের কাজই বাদ রাখেনি বরং সে তার নিজ হস্তে সব সম্পাদন করেছে, এমতাবস্থায় তার কি তাওবার ব্যবস্থা আছে? রাসূল (ﷺ) বলেনঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? তখন সে বললঃ আমি এই মুহূর্তেই সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন

উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। রাসূল (ﷺ) বলেনঃ হ্যাঁ, (এখন থেকে) তুমি মঙ্গলজনক কাজ করবে আর মন্দ ও পাপকাজ পরিহার করবে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সমস্ত সকল মন্দ কাজগুলোকে মঙ্গলময় কাজে পরিণত করে দেবেন। সে বললঃ আমার সকল প্রতারণা ও সকল পাপই কি পরিবর্তন হয়ে যাবে? রাসূল (ﷺ) বলেনঃ হ্যাঁ, সকল পাপই পরিবর্তন হবে। সে তখন বললঃ আল্লাহু আকবার। অতঃপর সে তাকবীর ধ্বনী বলতে বলতে লোক চক্ষুর আড়াল হয়ে যায়। (ইবনু আবী আসেম প্রণীত আল্ আ'হাদ ওয়াল মাসানীঃ ৫ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা। ইমাম আত্ ত্বারানী প্রণীত আল্ মু'জামুল কাবীরঃ ৭ম খণ্ড, ৫৩ ও ৩১৪ নং পৃষ্ঠা।)

ইমাম হায়ছামী তাঁর বিখ্যাত আল মাজমা' কিতাবের ১ম খণ্ড ৩২ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ অনুরূপ হাদীস ইমাম ত্বারানী ও ইমাম বায্যার বর্ণনা করেন। তবে বায্যারের বর্ণনাকারীগণ হুবহু সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ বিন হারূন আবূ নাশীত ব্যতীত। তিনিও নির্ভরযোগ্য।

সুতরাং ইসলাম ইতোপূর্বের সকল পাপকে মিটিয়ে ফেলে। আর খাঁটি তাওবাও তার পূর্বেকার সকল অপরাধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন এ ব্যাপারে নাবী (ﷺ) হতে হাদীস প্রমাণিত রয়েছে।

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে না, তার শাস্তি

ইতিপূর্বে যেমন এই কিতাবের মধ্যে আপনার নিকট এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন বা ধর্ম। আর তা সত্য এবং এমন দ্বীন যা নিয়ে সমস্ত নবী ও রাসূলগণ আগমন করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যে তাঁর কুফুরি করে, তাকে কঠিন শাস্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আর যেহেতু আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, অধিপতি ও কর্তৃত্বকারী, আর আপনি মানুষ হলেন তাঁর একটি সৃষ্টজীব। তাই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বজগতের সব কিছুকে আপনার অনুগত করেন, আপনার জন্য তাঁর বিধান রচনা করেন ও আপনাকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেন। সুতরাং আপনি যদি তাঁর উপর বিশ্বাস

আনেন এবং তিনি আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা পালন করেন, আর তিনি আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করেন, তাহলে আল্লাহ আপনার সাথে আখেরাত দিবসে যে স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা করেছেন তা লাভ করবেন। আর জ্ঞানের দিক দিয়ে যার সৃষ্টি পরিপূর্ণ এবং যাদের অন্তর অধিক পবিত্র যেমন– নবী, রাসূল, নেক্কার, ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতামণ্ডলী, আপনি তাদের মত হলেন। আর যদি আপনার প্রভুর কুফুরি করেন ও অবাধ্য হোন, তাহলে তো আপনি আপনার দুনিয়া ও আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আপনি তাঁর ঘৃণা ও আযাবকে গ্রহণ করলেন। আর আপনি সব চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং যাদের জ্ঞান সব চেয়ে কম ও যাদের অন্তর সব চেয়ে নিম্নতর যেমন; শয়তান, অত্যাচারী, ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও তাগুত তাদের মত হলেন। এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র।

নিম্নে বিস্তারিতভাবে কুফুরীর কিছু পরিণাম উপস্থাপন করলাম। যথা–

(১) ভয়-ভীতি ও অশান্তিঃ

যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনে এবং তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করে, তাদেরকে তিনি পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

[الأنعام : ٨٢]

অর্থাৎঃ প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের স্বীয় বিশ্বাসকে যুলুমের সাথে (শিরকের সাথে) সংমিশ্রিত করেনি, আর তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ৮২)

আর আল্লাহ হলেন নিরাপত্তা দানকারী, তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশ্বজগতে যা রয়েছে তার সব কিছুর অধিপতি। সুতরাং তিনি যদি কোন বান্দাকে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখার কারণে ভালবাসেন, তাহলে তিনি তাকে নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও স্থীরতা প্রদান করেন। আর মানুষ যদি তাঁর সাথে

কুফুরি করে, তাহলে তিনি তার নিরাপত্তা ও শান্তি ছিনিয়ে নেন। সুতরাং আপনি তাকে দেখবেন, সে আখেরাত দিবসে তার পরিণাম সম্পর্কে সর্বদা ভীত অবস্থায় আছে। আর সে তার নিজের উপর বিভিন্ন ধরণের বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধী এবং দুনিয়াতে তার ভবিষ্যতের ব্যাপারেও ভীত। আর এই নিরাপত্তাহীনতা এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকার কারণেই গোটা বিশ্বে জান ও মালের উপর বীমা তথা ইনসুরেন্সের মার্কেট গড়ে উঠেছে।

(২) সঙ্কীর্ণ জীবনঃ

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীর সব কিছুকে তার অনুগত করে দেন। আর তিনি প্রত্যেকটি মাখলুককে তার অংশ তথা রিযিক ও বয়স বন্টন করে দেন। তাইতো আপনি দেখতে পান, পাখি তার রিযিকের খোঁজে সকাল বেলা বাসা হতে বেরিয়ে যায় এবং রুযী আহরণ করে। এডালে ওডালে ছুটাছুটি করে এবং মিষ্টিসূরে গান গায়। আর মানুষও এক সৃষ্টজীব যাদের রিযিক ও বয়স বন্টন করা হয়েছে। সুতরাং সে যদি তার প্রভুর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর শরীয়তের উপর অটল থাকে, তাহলে তিনি তাকে সুখ ও প্রশান্তি দান করবেন এবং তার যাবতীয় কাজকে সহজ করে দেবেন। যদিও তা জীবন গড়ার সামান্য কিছু হোক না কেন। পক্ষান্তরে সে যদি তার প্রভুর সাথে কুফুরি করে এবং তাঁর ইবাদত করা হতে অহঙ্কার প্রদর্শন করে, তাহলে তিনি তার জীবনকে কঠিন ও সঙ্কীর্ণ করে দেবেন এবং তার উপর চিন্তা ও বিষণ্নতা একত্রিত জড়িয়ে দেবেন। যদিও সে আরাম-আয়েশের সকল উপকরণ এবং ভোগ সামগ্রীর বিভিন্ন প্রকার জিনিসের মালিক হয় না কেন। আপনি কি ঐ সমস্ত দেশে আত্মহত্যাকারীর আধিক্য লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের জনগণের বিলাসিতার সমস্ত উপকরণের দায়িত্ব নিয়েছে? এবং তাদের পার্থিব জীবনের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করার জন্য আপনি কি বিভিন্ন ধরণের অভিজাত আসবাবপত্র ও চিত্য বিনোদনের ভ্রমণের ক্ষেত্রে অপচয় লক্ষ্য করেননি? আর এ ব্যাপারে অপচয়ের দিকে যে জিনিসটি ধাবিত করে তা হলো– ঈমান বা বিশ্বাস শূণ্য অন্তর, সঙ্কীর্ণতা অনুভব এবং এ সব সঙ্কীর্ণতাকে পরিবর্তনকারী ও নতুন কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই মনঃকষ্টকে দূর করার প্রচেষ্টা করা।

আর আল্লাহ তা'য়ালা তো সত্যই বলেছেন, তিনি এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه : ١٢٤]

অর্থাৎঃ যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ তার জীবন- যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়। (সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ১২৪)

(৩) যে কুফুরি করে, সে তার আত্মা এবং সৃষ্টিজগতের যা তার চতুর্পার্শ্বে রয়েছে সেগুলোর সাথে সংঘাতের মধ্যে জীবন যাপন করে ঃ

কারণ তার আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাওহীদ তথা এককত্বের উপর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا [الروم : ٣٠]

অর্থাৎঃ আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম ৩০ ঃ ৩০)

আর তার শরীর তার প্রতিপালকের জন্য আত্মসমর্পণ করে এবং তার নিয়মে চলে। কিন্তু কাফের তার সৃষ্টি তথা প্রকৃতির বিরোধীতা করে এবং সে তার স্বেচ্ছামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তার প্রভুর আদেশের বিপক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে। ফলে তার শরীর আত্মসমর্পণকারী হলেও তার পছন্দ হয় বিপক্ষ। সে তার চারপাশের সৃষ্টি জগতের সাথে সঙ্ঘাতের মধ্যে রয়েছে। কারণ এই বিশ্বজগতের সব চেয়ে বড় থেকে আরম্ভ করে সব চেয়ে ছোট কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত সব কিছু ঐ নীতি নির্ধারণের উপর চলে, যা তাদের প্রতিপালক তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (فصلت:١١)

অর্থাৎঃ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্র বিশেষ। তারপর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো (আমার বশ্যতা স্বীকার কর) ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললঃ আমরা অনুগত হয়ে আসলাম। (সূরা হা-মীম-আসসাজদাহ ৪১ ঃ ১১)

বরং এই বিশ্বজগত ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করে যে, আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রে তার সাথে মিলে যায় এবং যে তার বিরোধীতা করে তাকে সে অপছন্দ করে। আর কাফের তো হলো এই সৃষ্টি জগতের মাঝে অবাধ্য, যেহেতু সে নিজেকে প্রকাশ্যভাবে তার প্রভুর বিরোধী হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। এ জন্য ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য তাকে, তার কুফুরিকে এবং তার নাস্তিকতাকে ঘৃণা করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً - لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً - تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً - أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً - وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا - إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً (مريم:٨٨ - ٩٣)

অর্থাৎঃ আর তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহন করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময় আল্লাহর উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যারাই রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে বান্দারূপে। (সূরা মাইয়াম ১৯ ঃ ৮৮-৯৩)

মহান আল্লাহ ফেরাউন এবং তার সৈন্যদল সম্পর্কে বলেনঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (الدخان:٢٩)

অর্থাৎঃ আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি। (সূরা দুখান ৪৪ ঃ ২৯)

(৪) সে মূর্খ হয়ে বেঁচে থাকেঃ

যেহেতু কুফর বা অবিশ্বাস হলো; মূর্খতা, বরং তা বড় মূর্খতা। কারণ কাফের তার প্রভু সম্পর্কে অজ্ঞ। সে এই বিশ্বজগৎকে দেখে; এটাকে তার প্রভু চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সে নিজেকে দেখে যা এক মহান কাজ ও গৌরবময় গঠন। তারপরও সে এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, এই বিশ্বজগতকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে তাকে গঠন করেছেন, এটা কি সব চেয়ে বড় মূর্খতা নয়?

(৫) কাফের তার নিজের প্রতি এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে তাদের প্রতি জুলুমকারী হিসাবে জীবন যাপন করেঃ

কারণ সে নিজেকে এমন কাজে নিয়োজিত করে, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। সে তার প্রভুর ইবাদত না করে বরং অন্যের ইবাদত করে। আর জুলুম হচ্ছে; কোন বস্তুকে তার অ-জায়গায় রাখা। আর ইবাদতকে তার প্রকৃত হকদার ব্যতীত অন্যের দিকে ফিরানোর চেয়ে বেশী বড় জুলুম আর কী হতে পারে। লোকমান হাকীম (عليه السلام) পরিষ্কারভাবে শিরকের নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে বলেনঃ

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان : ١٣]

অর্থাৎঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে মহা অন্যায়। (সূরা লোকমান ৩১ ঃ ১৩)

সে তার চারপাশের মানুষ ও সৃষ্টিকুলের প্রতি জুলুম করে। কারণ সে প্রকৃত হকদারের হককে অবহিত করে না। ফলে কিয়ামত দিবসে মানুষ অথবা জীব-জন্তু যাদের প্রতিই সে জুলুম করেছে, তারা সবাই তার সামনে এসে দাঁড়াবে এবং তার প্রতিপালকের কাছে তার নিকট হতে তাদের প্রতিশোধ নেয়ার আবেদন করবে।

(৬) দুনিয়াতে সে নিজেকে আল্লাহর ঘৃণা ও গজবের সম্মুখিন করেঃ

সুতরাং দ্রুত শাস্তিস্বরূপ সে বালা-মুসিবত ও দুর্যোগ অবতীর্ণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ - أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ - أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ [النحل : ٤٥ - ٤٧]

অর্থাৎঃ যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেন না অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারণাতীত? অথবা চলাফেরা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? তারা তো এটা ব্যর্থ করতে পারবে না। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করবেন না? তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৪৫-৪৭)

তিনি আরো বলেনঃ

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ [الرعد : ٣١]

অর্থাৎঃ যারা কুফরি করেছে তাদের কর্মফলের জন্যে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ৩১)

প্রশংসিত আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ [الأعراف : ٩٨]

অর্থাৎঃ অথবা জনপদবাসীরা কি এই ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর এমন সময় এসে পড়বে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ-প্রমোদে রত থাকবে? (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৯৮)

এমনিভাবে যারাই আল্লাহর যিকির বা স্মরণ থেকে বিমূখ থাকবে তাদের প্রত্যেকের এ অবস্থা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বিগত কাফের জাতির শাস্তির সংবাদ জানিয়ে বলেনঃ

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [العنكبوت : ٤٠]

অর্থাৎঃ তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দিয়েছিলাম, তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি শিলাবৃষ্টি, তাদের কাউকে আঘাত করেছিল বিকট শব্দ, কাউকে আমি দাবিয়ে দিয়েছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কারো প্রতি যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। (সূরা আনকাবূত ২৯ ঃ ৪০)

আর আপনি যেমন আপনার চারপাশে যাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মুসিবত লক্ষ্য করছেন।

(৭) তার জন্য ব্যর্থতা ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ঃ

সে তার জুলুমের কারণে ঐ বস্তু থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার দ্বারা আত্মা আরো বেশি উপকার লাভ করত। অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং তাঁর ডাকে সাড়া দানের মাধ্যমে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও প্রশান্তি লাভ করা। কিন্তু সে এটা না করে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ সে দুনিয়াতে শোচনীয় ও দিশেহারা হয়ে জীবন যাপন করে এবং সে এই দুনিয়ার জন্যই নিজের ক্ষতি করে সম্পদ জমা করে। অথচ তাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে নিজেকে সেই কাজে নিয়োজিত করে না এবং দুনিয়াতে সে সুখীও হয় না। কারণ সে হতভাগ্য হয়ে বেঁচে থাকে, হতভাগ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং কিয়ামত দিবসে তাকে হতভাগাদের সাথে পুনরুত্থিত করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ [الأعراف : ٩]

অর্থাৎঃ আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে ঐ সব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতো। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৯)

সে তার পরিবারের ক্ষতি করে, কারণ সে আল্লাহর সাথে কুফুরি করা অবস্থায় তাদের সাথে বসবাস করে। সুতরাং তারাও দুঃখ ও কষ্টের ক্ষেত্রে তার সমান এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الزمر : ١٥]

অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ১৫)

কিয়ামত দিবসে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে, আর তা কতইনা নিকৃষ্ট জায়গা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ [الصافات : ٢٢ ، ٢٣]

অর্থাৎঃ (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদত করতো–আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের পথে। (সূরা সা–ফ্ফাত ৩৭ ঃ ২২, ২৩)

(৮) সে তার প্রতিপালকের প্রতি অবিশ্বাসী এবং তাঁর নেয়ামতের অস্বীকারকারীরূপে জীবন যাপন করেঃ

আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অস্তিত্বহীন হতে সৃষ্টি করেন এবং তার প্রতি সকল প্রকার নেয়ামত পূর্ণ করেন। অতএব সে কিভাবে অন্যের ইবাদত করে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করে ..... কোন্ অস্বীকৃতি এর চেয়ে বেশী বড়? কোন অস্বীকৃতি এর চেয়ে বেশী নিকৃষ্ট?

(৯) সে প্রকৃত জীবন হতে বঞ্চিত হয়ঃ

কারণ পার্থিব জীবনের যোগ্য মানুষ তো সেই, যে তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার উদ্দেশ্যকে জানতে পারে। তার গন্তব্য তার জন্য স্পষ্ট এবং সে তার পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে। অতএব সে প্রত্যেক

হকদারের হক সম্পর্কে অবহিত, কোন হককেই সে অবজ্ঞা করে না এবং কোন সৃষ্টিজীবকে কষ্ট দেয় না। ফলে সে সুখীদের মত জীবনযাপন করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর জীবন লাভ করে। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً [النحل : ٩٧]

অর্থাৎঃ মু'মিন হয়ে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে, আমি তাকে অবশ্যই আনন্দময় জীবন দান করবো। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৯৭)

আর আখেরাতে রয়েছে ঃ

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [الصف : ١٢]

অর্থাৎঃ স্থায়ী জান্নাতের (আদন নামক জান্নাতের) উত্তম বাসগৃহ। এটাই মহা সাফল্য। (সূরা সাফ্ফ ৬১ ঃ ১২)

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই পার্থিব জীবনে চতুষ্পদ জানোয়ারের মত জীবনযাপন করে, সে তার প্রতিপালককে চেনে না এবং সে জানে না যে, তার উদ্দেশ্য কী? এবং এও জানে না যে, তার গন্তব্যস্থল কোথায়? বরং তার উদ্দেশ্য হলো; খাবে, পান করবে এবং ঘুমাবে। তাহলে তার মাঝে এবং সমস্ত জীব–জানোয়ারের মাঝে কী পার্থক্য? বরং সে তাদের চাইতে বেশী বড় বিপথগামী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ [الأعراف : ١٧٩]

অর্থাৎঃ আমি বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ রয়েছে; কিন্তু তা দ্বারা

তারা শোনে না, তারাই হলো পশুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত, তারাই হলো গাফেল বা অমনোযোগী। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৭৯)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো এরশাদ করেনঃ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا [الفرقان : ٤٤]

অর্থাৎঃ আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুর মত বরং তারা আরো বেশী পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরক্বান ২৫ ঃ ৪৪)

(১০) সে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেঃ

কারণ কাফের এক শাস্তি হতে আরেক শাস্তিতে স্থানান্তর হয়। তাই সে দুনিয়া হতে বের হওয়া থেকে আরম্ভ করে আখেরাত পর্যন্তবিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা ও বিপদ ভোগ করতে থাকে। এর প্রথম পর্যায়ে সে যে শাস্তির উপযুক্ত তা প্রদান করতে তার নিকট মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা আগমন করার আগেই শাস্তির ফেরেশতা আগমন করে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ [الأنفال : ٥٠]

অর্থাৎঃ (হে রাসূল!) আর আপনি যদি (ঐ অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেন। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৫০)

তারপর যখন তার রূহ বের হয় এবং তার কবরে অবতরণ করে তখন সে এর চেয়ে বেশী কঠিন শাস্তির মুখামুখি হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনের বংশধরের সংবাদ দিয়ে বলেন ঃ

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر : ٤٦]

অর্থাৎঃ সকাল–সন্ধায় তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আগুনের সম্মুখে, আর যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফেরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে। (সূরা গাফির (মু'মিন) ৪০ ঃ ৪৬)

তারপর যখন কিয়ামত হবে, সকল সৃষ্টিকুলকে পুনরুত্থিত করা হবে, মানুষের আমলসমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে, তখন কাফেররা দেখবে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের যাবতীয় আমলকে সেই কিতাবের মধ্যে লিখে রেখেছেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف : ٤٩]

অর্থাৎঃ আর সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদের দেখবেন আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা বলবে! হায়, আমাদের আফসোস! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট–বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি বরং সমস্ত কিছুর হিসাব (লিপিবদ্ধ করে) রেখেছে; তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখেই উপস্থিত পাবে; আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না। (সূরা কাহ্‌ফ ১৮ ঃ ৪৯)

সেখানে কাফের কামনা করবে যে সে যদি মাটি হতোঃ

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا [النبأ: ٤٠]

অর্থাৎঃ সেদিন মানুষ তার নিজ হাতের অর্জিত কৃতকর্মকে দেখবে আর কাফের বলতে থাকবেঃ হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা ৭৮ ঃ ৪০)

কিয়ামত দিবসের সেই অবস্থার তীব্র আতঙ্কের কারণে, মানুষ যদি পৃথিবীর সব কিছুর মালিক হতো, তাহলে অবশ্যই তারা সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচার জন্য তা মুক্তিপণ দিতো।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ [الزمر : ٤٧]

অর্থাৎঃ যারা জুলুম করেছে তাদের কাছে যদি সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো সম্পদ থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মুক্তিপণস্বরূপ সকল কিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেনঃ

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ - وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ - وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ [المعارج : ١١ - ١٤]

অর্থাৎঃ তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাবে আপন সন্তানকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার আত্মীয়–স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। (সূরা মাআ'রিজ ৭০ ঃ ১১ – ১৪)

কারণ সেই জায়গা (নিবাস) তো হল প্রতিদানের জায়গা, তা কোন আশা–আকাঙ্ক্ষার জায়গা নয়। সুতরাং মানুষ তার কর্মের প্রতিফল অবশ্যই পাবে; দুনিয়ায় যদি তার কর্ম ভাল হয়, তবে তার প্রতিদানও ভাল হবে আর দুনিয়ায় যদি তার কর্ম মন্দ হয়, তবে তার প্রতিদানও হবে মন্দ। আর আখেরাতের আবাসস্থলে কাফের যে মন্দ জিনিস পাবে তা হল জাহান্নামের শাস্তি। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করবেন, যাতে করে তারা তাদের মন্দ কর্মের কঠিন শাস্তি ভোগ করে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ [الرحمن : ٤٣ ، ٤٤]

অর্থাৎঃ এটা সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা রহমান ৫৫ ঃ ৪৩-৪৪)

আর তিনি তাদের পানীয় এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেনঃ

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ - يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ - وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ [الحج : ١٩ - ٢١]

অর্থাৎঃ সুতরাং যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা, তাদের পেটে যা রয়েছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহা হাতুড়িসমূহ। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ১৯ – ২১)

উপসংহার

হে মানুষ! আপনি তো অস্তিত্বহীন ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً (مريم: ٦٧)

অর্থাৎঃ মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না? (সূরা মারইয়াম ১৯ ঃ ৬৭)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা এক ফোটা শুক্রবিন্দু হতে আপনাকে সৃষ্টি করেন, তারপর আপনাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً - إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً (الانسان:١ - ٢)

অর্থাৎঃ মানুষের উপর অন্তহীন মহাকালের এমন এক সময় কি আসেনি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না? আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করবো, এজন্যে আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি। (সূরা দাহার ৭৬ ঃ ১–২)

আপনি ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, এরপর আবারও আপনার প্রত্যাবর্তন হয় দুর্বলতার দিকে। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (الروم:٥٤)

অর্থাৎঃ আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে। অতঃপর দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম ৩০ ঃ ৫৪)

অতঃপর সর্বশেষে হয় মৃত্যু, যার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। আর আপনি (জীবনের) সেই স্তরগুলোর এক দুর্বলতা হতে আরেক দুর্বলতায় স্থানান্তরিত হন, কিন্তু আপনি আপনার নিজের ক্ষতিকে দূর করার সামর্থ রাখেন না, আর আপনি এ ব্যপারে আপনার প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নিয়া'মত যেমন শক্তি, সামর্থ ও খাদ্য ইত্যাদির সাহায্য চাওয়া ব্যতীত আপনি আপনার নিজের কোন উপকার করতে পারেন না। আর আপনি তো সৃষ্টিলগ্ন হতেই অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী। আপনার জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, আপনার হাতের নাগালে নয়, এমন কত জিনেসেরই না আপনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ওগুলো আপনি কখনও লাভ করেন আবার কখনও তা ছিনিয়ে নেন। এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা আপনার উপকার করে, সেগুলো আপনি অর্জন করতে চান, ফলে কখনও ওগুলো জয় করেন, আবার কখনও অকৃতকার্য হন। এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা আপনার ক্ষতি করে, আপনার আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে, আপনার প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে এবং আপনার উপর বিপদ–আপদ ও কষ্ট নিয়ে আসে, আর আপনি তা বিদূরিত করতে চান, ফলে কখনও ওকে দূর করেন, আবার কখনও অপারগ হন। আপনি কি আল্লাহর নিকট আপনার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না? আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر:١٥)

অর্থাৎঃ হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ১৫)

ক্ষুদ্র ভাইরাসে আপনি আক্রান্ত হন, যা খালি চোখে দেখা যায় না, ফলে তা আপনাকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করে, কিন্তু আপনি তা দূর করতে সক্ষম হন না, আর তখন আপনি আপনার মত এক দুর্বল মানুষের নিকট গমন করেন এই আশা নিয়ে যে, সে আপনার চিকিৎসা করবে। সুতরাং কখনও ঔষধ কাজে লেগে যায় (রোগ ভাল হয়), আবার কখনও ডাক্তার তা ভাল করতে অপারগ হয়। তখন রোগী ও ডাক্তার উভয়ই দিশেহারার মধ্যে পড়ে যায়।

হে আদম সন্তান দেখুন আপনি কত দুর্বল! যদি একটি মাছি আপনার কোন জিনিস ছিনিয়ে নেয় (যেমন শরীরের রক্ত), তাহলে আপনি ওর থেকে তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন না। আর আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন; তিনি এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (الحج :٧٣)

অর্থাৎঃ হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, অতএব তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে, এটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না; পুজারী এবং দেবতা কতই না দুর্বল! (সূরা হজ্ব ২২ ঃ ৭৩)

সুতরাং সামান্য একটি মাছি যা আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তা যদি আপনি উদ্ধার করতে সক্ষম না হন, তাহলে আপনি আপনার কোন্ জিনিসের ক্ষমতা রাখেন? আপনার তাক্বদীর ও জীবন তো আল্লাহর হাতে, আর আপনার অন্তর তাঁর হাতের দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ওলট-পালট করেন। আপনার জীবন ও মৃত্যু এবং আপনার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাঁরই হাতে। আপনার নড়াচড়া ও নীরবতা এবং আপনার সমস্ত কথাবার্তা তাঁর অনুমতি ও ইচ্ছাতেই হয়। সুতরাং তাঁর বিনা হুকুমে আপনি নড়েন না এবং তাঁর বিনা ইচ্ছাই কোন কিছু করেন না। তিনি যদি আপনার

উপর আপনার নিজের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাহলে তো তিনি এক অক্ষম, দুর্বল, শিথিল, গুনাহ ও ভুলকারীর নিকট আপনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আর যদি তিনি অন্যের নিকট আপনার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাহলে তো তিনি আপনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এমন এক ব্যক্তির নিকট, যে ব্যক্তি আপনার কোন ক্ষতি, লাভ, মৃত্যু, জীবন এবং পুনরুত্থান করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তাঁর নিকট হতে আপনার এক পলক অমুখাপেক্ষী হওয়ার কোনই উপায় নেই। বরং গোপনে ও প্রকাশ্যে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আপনি তাঁর নিকট নিরুপায়। যিনি আপনার উপর সমস্ত নিয়া'মত পূর্ণ করেন। পক্ষান্তরে প্রত্যেক দিক দিয়ে তাঁর নিকট আপনার তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, পাপাচার ও কুফুরি করার মাধ্যমে আপনি তাঁকে ঘৃণিত করেন। আপনি তাঁকে ভুলে রয়েছেন, অথচ আপনাকে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর সামনে আপনাকে বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে। (ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহেমাহুল্লাহ রচিত "আল্-ফাওয়াইদ" ৫৬ (কিছু পরিবর্তিত)।

হে মানুষ! আপনার গুনাহর বোঝা বহন করার অক্ষমতা ও দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এরশাদ করেন ঃ

يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً (النساء: ٢٨)

অর্থাৎঃ আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, যেহেতু মানুষ দুর্বলরূপে সৃষ্ট হয়েছে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ২৮)

তাই তিনি রাসূল প্রেরণ করেন, কিতাব অবতীর্ণ করেন, বিধি-বিধান

প্রবর্তন করেন, আপনার সামনে সঠিক পথ দাঁড় করান এবং যুক্তি, দলীল-প্রমাণাদী ও সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি তিনি আপনার জন্য প্রতিটি বিষয়ে এমন নিদর্শন স্থির করেন যা তাঁর এককত্ব, প্রভুত্ব ও উপাসনার প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে আপনি বাতিল দিয়ে হক্ব বা মহাসত্যকে দূর করেন এবং আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেন ও বাতিলের সাহায্যে বিতর্কে লিপ্ত হন।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (الكهف: ٥٤)

অর্থাৎঃ আর মানুষেরা অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। (সূরা কাহাফ ১৮ ঃ ৫৪)

আর আপনাকে আল্লাহর ঐ সমস্ত নিয়া'মতের কথা ভুলিয়ে দেন, যার মধ্যে আপনি আপনার শুরু এবং শেষ অতিবাহিত করেন! আপনি কি স্মরণ করেন না, আপনাকে এক ফোঁটা শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে? তার পর আপনার প্রত্যাবর্তন হবে কবরে, অতঃপর সেখান হতে আপনার পুনরুত্থানের পর ঠিকানা হবে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْأِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ - وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي - الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (يّـس:٧٧- ٧٩)

অর্থাৎঃ মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ হঠাৎ করেই সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা পেশ করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলেঃ হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পচে গলে যাবে? (হে রাসূল ﷺ) আপনি তাদেরকে বলুনঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তো তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)

তিনি আরো বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ - فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (الإنفطار : ٦ – ٨)

অর্থাৎঃ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (সূরা ইন্‌ফিতার ৮২ ঃ ৬-৮)

হে মানুষ! আপনি মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকবেন এই আনন্দ থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন? যাতে করে তিনি আপনাকে

অভাবমুক্ত করেন, আপনাকে আরোগ্য দান করেন, আপনার বিপদ-আপদ দূর করেন, আপনাকে ক্ষমা করেন, আপনার অনিষ্টকে অপসারণ করেন, আপনার প্রতি জুলুম করা হলে সাহায্য করেন, আপনি দিশেহারা এবং পথভ্রষ্ট হলে পথ দেখান, আপনি অজ্ঞ হলে শিক্ষা দেন, ভয় পেলে নিরাপত্তা দেন, আপনার দুর্বলতার সময় দয়া করেন, আপনার শত্রুদেরকে আপনার নিকট হতে নিবৃত্ত করেন এবং আপনাকে রিযিক দেন।

হে মানুষ! আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে যে সব নেয়া'মত দান করেছেন তার মধ্যে দ্বীন বা ধর্মের নেয়া'মতের পর সব চেয়ে বড় নেয়া'মত হল জ্ঞান বা বুদ্ধি। কারণ যা তার উপকার করে এবং যা ক্ষতি করে, সে এই জ্ঞানের মাধ্যমে পার্থক্য করে, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে বোঝে এবং এর মাধমেই সে জানতে পারে মানুষ সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যকে। আর তা হলো: একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত বন্দেগী করা, যার কোন অংশীদার নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ - ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (النحل:٥٣ - ٥٤)

অর্থাৎঃ তোমরা যে সব নেয়া'মত ভোগ কর, তা তো আল্লাহরই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। এরপর যখন আবার আল্লাহ তোমাদের দুঃখ কষ্টকে দূরীভূত করেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে অংশীদার স্থীর করে। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৫৩-৫৪)

হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই জ্ঞানবান ব্যক্তি মহত্তর কর্মসমূহ পছন্দ করে এবং নিকৃষ্ট ও নীচু কর্মসমূহকে ঘৃণা করে, আর প্রত্যেক সম্মানিত নবী ও সৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করা ভালবাসে এবং সে তাদের নাগাল না পেলেও তাঁর মন সব সময় তাদের সাথে মিলিত হতে চায়। আর সে পথ পাওয়ার রাস্তা তো হল ওটাই। মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে যে পথ নির্দেশ করেছেনঃ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ (آل عمران :٣١)

অর্থাৎঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আল-ইমরান ৩ ঃ ৩১)

সুতরাং সে যদি এই বাণী মান্য করে চলে, তবে আল্লাহ তাকে নবী, রাসূল, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً (النساء : ٦٩)

অর্থাৎঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করবে, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৯)

হে মানুষ! আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি একটি নির্জন স্থানে একাকী হন, অতঃপর চিন্তা করুন; আপনার নিকট সত্য কি এসেছে? আপনি তার দলীল দেখুন এবং তার যুক্তি ও প্রমাণাদী নিয়ে গবেষণা করুন। ফলে আপনি যদি দেখেন যে তা সত্য, তাহলে তার অনুসরণ করুন। কখনও বন্ধুত্ব ও প্রথার নিকট বন্দী হবেন না। জেনে রাখবেন! নিশ্চয়ই আপনার আত্মা আপনার নিকট, আপনার বন্ধু-বান্ধব, জমি-জমা এবং বাপ-দাদার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির চেয়েও অধিক সম্মানিত। আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদেরকে এর উপদেশ দেন এবং বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (سبأ:٤٦)

অর্থাৎঃ (হে রাসূল ﷺ) আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুই জন অথবা এক এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখো– তোমাদের সাথী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা ৩৪ ঃ ৪৬)

হে মানুষ! আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আপনার কোন কিছু ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً (النساء:٣٩)

অর্থাৎঃ আর এতে তাদের কী হতো, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তা হতে ব্যয় করতো? আর আল্লাহ তাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৩৯)

ইমাম ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ তারা যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল পথে চলে তবে তাদেরকে কোন্ জিনিস ক্ষতি করবে? বরং তারা যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ঐ খাতে ব্যয় করে যা তিনি ভালবাসেন ও পছন্দ করেন; তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে কিয়ামত দিবসে সৎ আমলকারীদের সাথে যেমন আচরণ করবেন, তাদের সাথেও তেমনই আচরণ করবেন। আর তিনি তো তাদের সৎ ও বাতিল নিয়ত এবং তাদের মধ্যে কে আল্লাহর তওফীক পাওয়ার হকদার সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন। ফলে তিনি তাকে তওফীক দান করেন এবং তার হেদায়েতের দিকে এলহাম করেন। আর তিনি তাকে এমন সৎ কাজের জন্য নিয়োজিত করেন যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। আর মহান আল্লাহর নৈকট্য হতে কে ব্যর্থ ও বিতাড়ণের হকদার তাও তিনি অবগত আছেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর নিকট হতে বিতাড়িত সে তো দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (তাফসীরুল কুরআ'নিল আযীম তাফসীরে ইবনে কাসীর হতে কিঞ্চিত পরিবর্তন করে; ১ম খণ্ড, ৪৯৭ নং পৃষ্ঠা)।

নিশ্চয়ই আপনার ইসলাম গ্রহণ করা আপনার মাঝে এবং আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন এমন যে কোন কাজ আপনি করবেন তার মাঝে, কখনও বাধা সৃষ্টি করে না। বরং আল্লাহ আপনাকে প্রত্যেক আমলের বিনিময়ে সওয়াব দেবেন যা আপনি একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করেন। যদিও তা আপনার দুনিয়ার কাজে লাগে এবং আপনার সম্পদ, মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করে। এমনকি আপনি যে সমস্ত মুবাহ বা বৈধ কোন

কিছু গ্রহণ করেন, সে ক্ষেত্রে যদি হারাম হতে হালালের উপর তৃপ্ত হয়ে সওয়াব কামনা করেন, তাহলেও ওর মধ্যে আপনার জন্য সওয়াব আছে। নাবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো স্ত্রী সহবাসেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে হয় যে, আমরা যৌন তৃপ্তি অর্জন করবো আর তাতে সাওয়াবও রয়েছে? রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ তোমরা বল তো দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তা হলে তার কি গুনাহ হবে না? অতএব সে যদি তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে অবশ্যই সাওয়াব হবে। (মুসলিম ঃ যাকাত পর্ব; হাদীস নং ১০০৬)

হে মানুষেরা! নিশ্চয়ই রাসূলগণ সত্য সহকারে আগমন করেন এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য প্রচার করেন। আর মানুষ তাঁর শরীয়তকে জানার ব্যাপারে মুখাপেক্ষী, যাতে করে সে এই পার্থিব জীবনে বুদ্ধিমত্তার সাথে চলতে এবং আখেরাতে কামিয়াব হতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيما (النساء : ١٧٠)

অর্থাৎঃ হে মানুষেরা! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সত্যসহ রাসূল আগমন করেন, অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তবে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১৭০)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (يونس: ١٠٨)

অর্থাৎঃ (হে রাসূল ﷺ) আপনি বলে দিনঃ হে মানুষেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য (দ্বীন) এসেছে, অতএব যে

ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুত সে নিজের জন্যেই সঠিক পথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তারই উপর বর্তাবে, আর আমাকে তোমাদের উপর দায়বদ্ধ করা হয়নি। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ১০৮)

হে মানুষ! আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনার নিজেরই লাভ। আর যদি আপনি কুফুরি করেন তবে আপনার নিজেরই ক্ষতি। মহান আল্লাহ তো তাঁর বান্দা হতে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং অবাধ্যদের অবাধ্যতা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর আনুগত্যকারীর আনুগত্যও তাঁর কোন উপকার করতে পারে না। ফলে তাঁর অজান্তে কেউ পাপ কার্য করতে এবং তাঁর বিনা হুকুমে কেউ আনুগত্য করতে পারে না। যেমন নাবী (ﷺ) আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ দেন যে, তিনি বলেনঃ হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি; আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিলাম। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়েত দান করি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়েত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করি, সে ছাড়া সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে কাপড় পরিয়েছি সে ব্যতীত তোমরা সবাই বিবস্ত্র। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত–দিন গুনাহ করছ, আর আমি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে, আমার ক্ষতি করবে, আর তোমরা কখনই আমার ভাল করার সামর্থ রাখ না যে, আমার ভাল করবে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় মুত্তাক্বী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয় হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে একজন সব চেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয় হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ

ও জ্বিন যদি একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই, তবে আমার কাছে যা আছে তাতে সমুদ্রে একটি সুই ডুবালে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছুই কম হতে পারে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্যে গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে এর বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত। (সহীহ মুসলিমঃ সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা ও আদাব অধ্যায় এবং সকল প্রকার জুলুম হারাম পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২৫৭৭)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নাবী ও রাসূলগণের সর্বোত্তম ব্যক্তি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সহচরবৃন্দের উপর।

সমাপ্ত

الإِسْلَام أُصُوله ومَبَادئه

(باللغة البنغالية)

تأليف

الشيخ محمد بن عبد الله بن صالح السحيم

ترجمه

محمد سيف الإسلام

(الليسانس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية)

راجعه

محمد عبد الرب عفان

(إيم إيم دكا والليسانس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية)